ভারত পথিক লিও টলস্টয়

ঝরা বসু



মনীষা

Leo Tolstoy : Jhara Basu

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৬০

প্রকাশক
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড
৫৪এ, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
দিলীপ দাস

মুদ্রক
মৃণাল কান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

ভূমিকা

ভারত সখা টলস্টয়

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গান্ধীজী যে তিনজনকে গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন তাঁদের একজন ছিলেন টলস্টয়, একজন রাসকিন ও একজন থোরো। তিনজনের মধ্যে কোন্ জনের প্রতি তিনি সর্বাধিক অনুগত তা বলা শক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে তিনি ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সেক্ষেত্রেও আবার সেই তিনজনের প্রতি আনুগত্য। যতদূর মনে পড়ে ১৯১৮ কি '১৯ সালে তিনি বলেন তিনি একজন টলস্টয়ান। মৃত্যুর পূর্বেও তিনি একবার টলস্টয়ের 'বোকা ইভান' নামক রূপকথার উল্লেখ করেন। সেই রূপকথার আদলেই তার যুদ্ধবিগ্রহহীন সমাজের কল্পনা।

টলস্টয়ের জীবদ্দশায় রাশিয়ায় বহু লোক স্বেচ্ছায় টলস্টয়ান হয়েছিল। তারা উচ্চ শ্রেণীর সন্তান হলেও শ্রমিক কৃষকের মতো জীবন যাপন করত। হাতে তৈরী খাদির পোষাক পরত। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় তাদের আস্থা ছিল না। রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে তো নয়ই। ধর্মেরও উদারতর ব্যাখ্যা দিত। যথাসম্ভব আদি খ্রীষ্টান স্ত্রী পুরুষের মতো বাস করত। দক্ষিণ আফ্রিকার টলস্টয় ফার্মে গান্ধীজী সেই আদর্শ রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন॥ কিন্তু তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল রাসকিনের মতবাদ। শেষতম মজুরটিকেও প্রথমটির সমান মজুরি দিতে হবে। যদিও তাকে কাজে লাগানো হয়েছে অনেক দেরিতে। রাসকিনের 'আন্টু দিস লাস্ট' গ্রন্থটির গুজরাটি অনুবাদ করেন গান্ধীজী। নাম দেন 'সর্বোদয়', সেই সর্বোদয়ই তাঁর মৃত্যুর পরে গান্ধীবাদীদের অন্বিষ্ট হয়েছে।

টলস্টয় যেটা চেয়েছিলেন সেটা অপ্রতিরোধ। থোরো যেটা করেছিলেন সেটা অসামরিক প্রতিরোধ। এক্ষেত্রে গান্ধীজী টলস্টয়ের চেয়ে থোরোর আরো কাছে। তিনি এর নামকরণ করেছিলেন সত্যাগ্রহ। গান্ধীবাদ বলতে যা বোঝায় তার একটি সূত্র হচ্ছে সত্যাগ্রহ, আরেকটি সর্বোদয়। টলস্টয় তার মৃতুর পূর্বে গান্ধীজীকে যে পত্র লেখেন সেটি পৌছয় তাঁর মৃত্যুর পরে। সেটিতে তিনি গান্ধীজীর কার্যকলাপের প্রশংসা করে বলেছিলেন যে এযুগের পৃথিবীতে ওর

চেয়ে মহত্তর কাজ আর নেই। চিঠিখানি পড়লে মনে হয় টলস্টয় তাঁর হিংসাবিরোধী কার্যকলাপের উত্তরাধিকার গান্ধীকে দিয়ে যান।

স্বামী বিবেকানন্দ হিংসায় বিশ্বাস করতেন বলে টলস্টয় তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন। তাঁর জীবনীতে একথা আমি পড়েছি। টলস্টয়ের শেষ জীবন হিংসার বিরুদ্ধে নিবেদিত। এক গান্ধীজীর মধ্যেই তিনি মনের মানুষ পেয়েছিলেন, আর কারো মধ্যে নয়। ভারতের পথ কি অবিমিশ্র অহিংসার পথ। তা হলে টলস্টয়কে ভারতপথিক বলা কেন। তিনি খ্রীস্টধর্মের সারবস্তুর পুনরুদ্ধার করে সেই অনুসারে সমাজ ও রাষ্ট্রের পুনর্বিন্যাস চেয়েছিলেন। বেদ উপনিষদের বা গীতার সারবস্তুর পুনরুদ্ধার করে সেই অনুসারে সমাজ ও রাষ্ট্রের পুনর্বিন্যাস চান নি। তবে অপরের ধর্মবিশ্বাসের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল ও তার থেকে সারসংগ্রহ করতে তাঁর আগ্রহ ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, তাও, জরথুস্ট্রীয়, ইহুদী, মুসলিম প্রভৃতি কাউকেই তিনি বাদ দেন নি। সুতরাং ভারতপথিক বলে তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না। বরং বলা যেতে পারে ভারত সখা। তার চেয়ে বড়ো মানব সখা। সবদেশের লোক তাঁকে চিঠি লিখে উপদেশ চাইত।

রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়কে তাঁর কার্যকলাপের অন্যতম গুরু করেন নি। তাঁর রচনাবলীর কোথাও টলস্টয়ের প্রভাব পড়েনি। তবে তিনি এক জায়গায় টলস্টয়কে ইউরোপের বিবেক বলে অভিহিত করেছিলেন। 'আনা কারেনিনা' তাঁর ভালো লাগে নি। 'রেজারেকশন' যে তাঁর ভালো লেগেছিল তার প্রমান নেই। রুশদেশের চাষী মজুর শ্রেণীর ভালো লাগা রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগা নয়। আর্ট সম্বন্ধে দুই মহাশিল্পির দু'রকম থিওরি। তবে দু'জনেই আদর্শবাদী। দু'জনেই পল্লী সভ্যতার পক্ষপাতী। দু'জনেই মানুষকে ভালোবাসেন। প্রকৃতিকে ভালোবাসেন। দু'জনেই জমিদার, অথচ জমিদারির উপর বীতরাগ। টলস্টয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল যত, অমিল তার চেয়ে বেশী। টলস্টয় যুদ্ধ করেছিলেন, অভিজাতদের যতগুলি নেশা সবগুলিতে মশগুল ছিলেন। সুরা আর জুয়া আর মৃগয়া। মৃগয়া বলতে নারীমৃগয়াও বোঝায়। অসাধারণ তাঁর অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য। তাঁর সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। ভারতে তো নয়ই। তিনি ছাড়া আর কেউ 'সমর ও শান্তি' বা 'আনা কারেনিনা' বা 'রেজারেকশন' লিখতে পারতেন না। তাঁর দোষও যেমন অনেক গুনও তেমনি অনেক। কোনো কোনো দোষ অমার্জনীয়। গোটা মানুষটাকেই এঁকেছেন গোর্কি। রবীন্দ্রনাথের সেটা পছন্দ হয় নি।

শ্রীমতী ঝরা বসুর এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট এতে টলস্টয়কে লেখা কয়েকটি মূল্যবান পত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনোটি এই প্রথম বার। এতে ভারতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরো পরিষ্কার হবে। আমরা তাঁকে একজন ভারতীয় বলে যদি মনে করি তবে খুব একটা ভুল হবে না। আমাদের সঙ্গে তিনি একাত্ম হতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষ বয়সে কট্টর নিরামিষাশী, জীবহত্যা ও নরহত্যা বিরোধী, মদ্য পরিত্যাগী, ধনসম্পত্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যবিরাগী গৃহস্থ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। ভীষণ একটা টানা পোড়েন চলেছিল ব্রহ্মচর্য ও নারীসঙ্গ নিয়ে। শত্রু বলতে তাঁর একটি প্রাণীই ছিল। তার নাম নারী। নারীর সঙ্গে সন্ধি কোনোদিনই হলো না। গোর্কিকে তিনি বিশ্বাস করে বলেছিলেন, "কফিনে শায়িত হয়ে আমি নারী সম্বন্ধে আমার শেষ কথাটি বলব, তার পরে মুখের উপর চাদর টেনে নেব।"

শ্রীমতী ঝরা বসুর এই বই খানির পেছনে রয়েছে টলস্টয় সম্বন্ধে তাঁর বিস্তর গবেষনা। আর সেই গবেষনার পেছনে টলস্টয়ের উপর ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা। আশা করি টলস্টয় প্রসঙ্গ তিনি আরো লিখবেন ও টলস্টয়কে আরো ভালো করে চিনিয়ে দেবেন।

অন্নদাশঙ্কর রায়

কথারম্ভ

বহুকোটি জনতা-যারা টলস্টয়কে শ্রদ্ধা করেন আমি তাঁদেরই একজন। বিশ্বখ্যাত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যিনি পঞ্চাশোর্দ্ধে সগৃহে সন্ন্যাসীর জীবনচর্যা বেছে নিয়েছিলেন, মংগলের জন্য যিনি জমিদারীর সুখ ভোগ ত্যাগ করে মুজিকের শ্রমজীবনকে গ্রহণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে ইউরোপের গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখেছেন সেই অন্তহীন সত্যদর্শী পন্থচারী বারবার আমার হৃদয় অনুরাগ কেড়ে নিয়েছেন। প্রথম পাঠে 'যুদ্ধ ও শান্তির' লেখককে অহিংসবাদী বলে জেনেছিলাম, 'অ্যানা কারেনিনা' ও 'ক্রুৎজার সোনাটায়' জীবনায়নের আশ্চর্য শৈল্পিক সার্থকতা আমার উপলব্ধির প্রগাঢ়তা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তখনও জানি নি 'পুনরুজ্জীবন' শুধু তাঁর একটি উপন্যাসেরই নাম নয়। তিনি সমগ্র মানববিশ্বকে পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রে শোধিত করতে চেয়েছিলেন। আমার মত অনেক ভারতীয়ই লিও টলস্টয় সম্পর্কে এই ধারণাগুলি বহুকাল ধরে পোষণ করে আসছেন। তার ফলে রচিত হয়েছে টলস্টয়কে নিয়ে বেশ কয়েকটি আলোচনা গ্রন্থ। টলস্টয় যে ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় সেই সত্য রলাঁও লক্ষ্য করেছিলেন সাগ্রহে। 'ভারত পথিক লিও টলস্টয়' সেই মহানুভব চর্চার এক নতুন দিক উদ্ঘাটিত করবে। যদিও আমার পাঠ্যাভ্যাসের বহু সময় কেটেছে টলস্টয়কে নিয়ে, কিন্তু তাঁকে নিয়ে প্রবন্ধাবলী লক্ষ্যে পৌছন গেছে তাঁর দেড়শত বছরের জন্মজয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করে। ঐ উৎসবকে কেন্দ্রকরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নস্থানে আয়োজিত কয়েকটি আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছিলাম। আর সেই সময়ে আমার কয়েকটি প্রবন্ধ নানা পত্র পত্রিকায় ছাপান হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে আরও কিছু অনুসন্ধিৎসা ও অনুশীলনের দ্বারা প্রবন্ধাবলী পরিমার্জিত করে নবরূপে 'ভারতপথিক লিও টলস্টয়' নামে প্রকাশিত করা হল।

ভারতের পুন্যভূমিতে টলস্টয় ছিলেন মানসযাত্রী। ভারতে তিনি কোন দিন আসেন নি সত্য—কিন্তু তার থেকে সত্যতর এই যে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন যুবক টলস্টয়কে ভারতের তথাগতের বানী থেকে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যিনি ভারতাত্মাকে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন, ভারত সন্তানেরাও তাঁকে অতি আপন

করে পেয়েছেন সহজে। তদ্‌কালীন মনস্বী ভারতীয়গণ জাতীয় সংকটকালে পথের সন্ধান চেয়েছেন টলস্টয়ের কাছে। সাগ্রহে তিনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন তাঁদের দিকে। বিশাল প্রতিভার বিশেষত এই দিকটিকে উদ্‌ঘাটিত করবার চেষ্টা করেছি বর্তমান গ্রন্থে।

গান্ধীজীর ইচ্ছা ছিল 'লেটার টু এ হিন্দু' ভারতীয় নানা ভাষায় অনূদিত হোক। এই গ্রন্থে গান্ধীজীর আশা পূরনের চেষ্টা করেছি। সম্ভবত 'লেটার টু এ হিন্দু,' এই প্রথম বঙ্গভাষায় অনূদিত হল। গান্ধী-টলস্টয় ছাড়াও তারকনাথ দাস টলস্টয়ের পত্রগুচ্ছের অনুবাদও এই গ্রন্থের সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের সঙ্গে টলস্টয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করতে সাহায্য করেছে অধ্যাপক সিফম্যান রচিত Tolstoy and India গ্রন্থটি। তথ্যপূর্ণ গবেষণাধর্মী এই বইটিকে আমি আকর গ্রন্থ বলে মনে করি। এই বইটি থেকে কিছু তথ্যাবলী গ্রহণ করেছি। যদিও বিশ্লেষন ও মন্তব্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। অধ্যাপক সিফম্যানকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

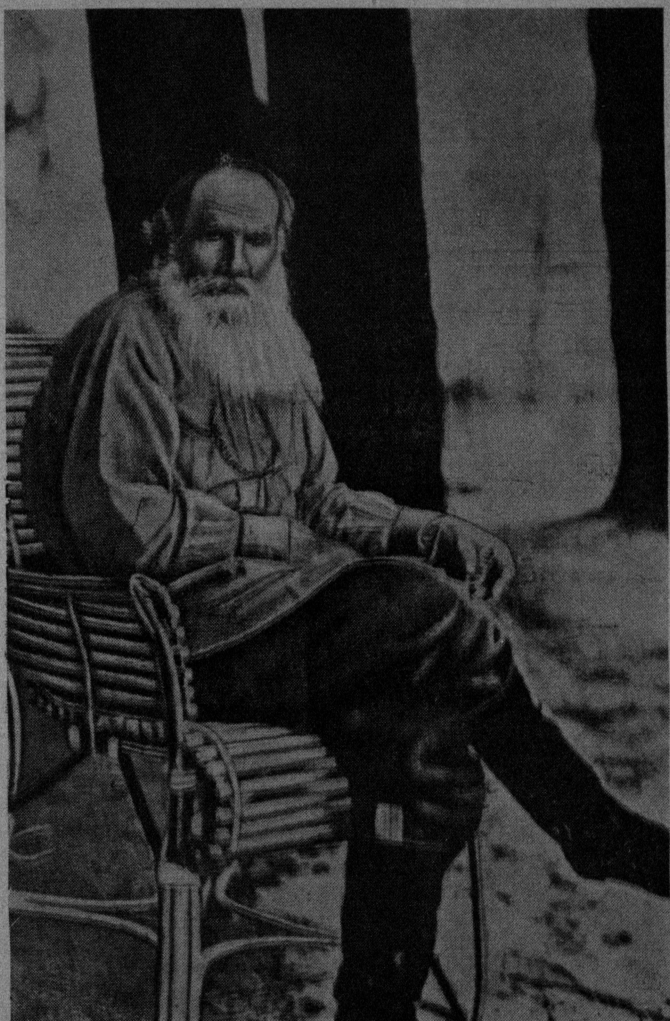
আমার এই কাজে শ্রদ্ধেয় শ্রী চিন্মোহন সেহানবীশের উৎসাহ ও নির্দেশ ছাড়া অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাই শ্রীমতী রত্নামজুমদারকে, শ্রীমতী ইনা বসুকে ও মনীষা গ্রন্থালয়ের সকল কর্মীবৃন্দকে যাঁদের উৎসাহে ও সাহায্যে আমার গ্রন্থটি প্রকাশ পাচ্ছে। একই কারণে ধন্যবাদ দেব শ্রী দিলীপ বসু ও শ্রীমনি সান্যালকে।

টলস্টয়েরশেষ বয়সের ছবিটি জোগাড় করা গেছে সাহিত্যিক শ্রীবিমল করের সৌজন্যে। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। সব শেষে অজস্র কৃতজ্ঞতা-সহ শ্রদ্ধা জানাই সাহিত্যিক শ্রী অন্নদাশংকর রায়কে। যাঁর জীবন ও সাহিত্যে লিও টলস্টয় বড় প্রেরণা। যিনি অশীতিপর বয়ঃসীমানাতেও সাহিত্যের কর্মযজ্ঞশালায় ব্যস্ত কর্মী, সৌভাগ্য আমার বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকাটি সযত্নে তিনি লিখে দিয়েছেন। 'ভারতপথিক লিও টলস্টয়' যদি টলস্টয় অনুধ্যানে ও গবেষনায় নতুন পথ দেখাতে পারে তবে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে—এই আশা রাখি।

বিনীত—

ঝরা বসু

সূচী



লিও টলস্টয়

প্রথম অধ্যায়

ভারতের সখা টলস্টয়

ভারতের উত্তর প্রান্তে হিমালয়ের উচ্চচূড় পর্বতমালা অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিমে মাইলের পর মাইল এগিয়ে গেলে রুশভূমির ইয়াসনায়া পলিয়ানা পল্লী। গ্রামের নামে মাধুর্য আছে, তার থেকে মধুর এই পল্লীর প্রাণপুরুষের অন্তরটি। তিনি টলস্টয়—সিন্ধু সমান হৃদয়ের অধিকারী। ব্যাপ্তি ও বিশালতায় অন্তর্লীন আন্তরিকতায় আর জীবন উচ্ছ্বাসের উদধি উল্লাসে সেই সমুদ্র সদা চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে। তিনি মানুষের বন্ধু, নিপীড়ন ও নির্যাতনে পরিক্লিষ্ট মানুষের সহায় তিনি। প্রতি প্রভাতে প্রাতঃরাশের টেবিলে জড় হত বিভিন্ন প্রান্তবাসীর অসংখ্য পত্রাবলী। প্রত্যেকেরই এক প্রার্থনা পথ দেখাও, দাসত্ব থেকে, ঔপনিবেশিক অত্যাচার থেকে, শোষিতের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির সন্ধান দাও। সমগ্র জীবনে টলস্টয় ৫০,০০০ এই জাতীয় চিঠি পেয়েছেন, বিস্ময় জাগে সদা ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রত্যুত্তর দিয়েছেন প্রায় ১০,০০০ চিঠির। পরিসংখ্যান দিয়ে কি আর সমুদ্রের গভীরতা মাপা যায়? বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয়েছে, টলস্টয়ের হৃদয় বাঁশরীতে তখনি সেই সুর জেগেছে। টলস্টয়ের মত বোধকরি অন্য কোন সাহিত্যিক পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যার সংগে এতটা জড়িয়ে পড়েন নি। 'I am deeply involved in our times'—নিজেই জানিয়েছেন আমাদের। এই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিস্তৃতিতে তিনি আত্মতৃপ্তি পেতেন প্রচণ্ড। ১৯১০ সালে একদা চিঠিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—"I am ashamed to admit this, but I rejoice at Tolstoy's prestige. Thanks to it my relations are like radii going out to remote countries. The Far East, India America, Australia".

চিঠি পেতেন তিনি সুদূর চীন, জাপান থেকে, ভারত থেকে, তুর্কি ও আরব দেশ থেকে, আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ও ইউরোপের ইটালী থেকে। উত্তর দিতেন প্রায় অনেক চিঠিরই। চিঠির শেষে লেখা থাকত—"I am happy to have established contact with you"—উদারতার সঙ্গে মিশ্রিত হত তাঁর বিনয় ও নম্রতা! আর এরই নাম মহত্ত্ব।

আফ্রিকা, দূর প্রাচ্য ও ভারত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। কারণ এই দেশগুলিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা ও তাদের স্বেচ্ছাচারিতা প্রচণ্ড রূপ পরিগ্রহ করেছিল। টলস্টয় বরাবর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। যখনই যেদেশে তিনি স্বেচ্ছাচারী শাসকের দুষ্ট শাসন দেখেছেন তিনি তার বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছেন। ভারতের ব্রিটিশ স্বৈরাচারকে যেমন তিনি নিন্দা করেছেন, তেমনি ইন্দোচীন ও বেলজিয়ামে ফরাসী শাসকদের, আবেসিনিয়াতে ইটালী শাসকদের, চীন, কিউবা ও ফিলিপিনে আমেরিকার শাসকদের তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। আর এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর বিখ্যাত বিখ্যাত গদ্য রচনা ও পত্র সাহিত্য। 'কি তাহলে আমাদের কর্তব্য', 'দুই যুদ্ধ', 'ইটালীবাসীদের প্রতি বাণী' 'এর চেয়ে ভাল চিন্তা কর,' 'চীন দেশবাসীকে চিঠি,' 'কোন এক ভারতীয়কে লেখা চিঠি'।

শান্তি ও প্রেমের মূর্তি টলস্টয় নিজে। কিন্তু দুঃখ এই তিনি যে যুগে বেঁচেছিলেন সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে অত্যাচারীদের যুগ বলা চলে। স্বৈরতন্ত্র ঔপনিবেশিকতার চূড়ান্ত কুফল তখন দরিদ্র নিরীহ দেশগুলির কণ্ঠরোধ করছে। জোরে কাঁদবার তাদের সাহস ছিল না। তাদের লুকিয়ে কান্নার চিঠি তারা আবেগ ভরে পাঠাতেন এই মহাদরদী ব্যক্তিটিকে।

ভারতের দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের জন্য টলস্টয় অনুভব করেছেন বারবার। এইজন্য তিনি ভারতে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। রুশ দেশের জাতীয় লেখক ভারতের জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা পেয়েছেন।

ভারতভূমিতে তিনি আসেন নি কোনও দিনও। কিন্তু কয়েকজন ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। আর সেই সুযোগে ভারতাত্মা তাঁর নিকট আরও বেশী স্পষ্ট ও ব্যঞ্জনাত্মক হয়ে উঠল। পত্রাবলীর মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপিত হবার (১৮৯৬ খ্রী:) বহু আগে থেকেই অবশ্য টলস্টয়ের ভারত-প্রীতির উন্মেষ ঘটেছিল। ইয়াসনায়া পলিয়ানায় বসেই তাঁর জ্ঞান ও হৃদয়ের রাজ্যে ভারত জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় দর্শনের সনাতন ঐতিহ্যের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পাঠক। একদিকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও জাতকের গল্প, অপরদিকে উপনিষদ, গীতা, বেদ, বেদান্ত ও বিশেষতঃ বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি যথার্থ অর্থেই ভারত পথিক।

বৌদ্ধ দর্শনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন টলস্টয়। রেঁামারেঁালা টলস্টয়ের জীবনী গ্রন্থে জানিয়েছেন, যখন টলস্টয় উনিশ বছরের যুবক, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, কাজান হাসপাতালে থাকাকালীন তিনি এক বৌদ্ধলামার সাক্ষাৎ পান এবং তার কাছেই বুদ্ধের মূল বাণীগুলো সম্পর্কে অবহিত হন। শান্তি ও মৈত্রী বৌদ্ধ দর্শনের মূল সূত্র। টলস্টয়ের প্রেমধর্ম ও নির্বিরোধ নীতির মূল সূত্রটি বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্রের দ্বারা হয়তো কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। ১৮৮৯ খ্রী: গৌতম-বুদ্ধের উপরে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তাঁর স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন From to-day I have begun to write on Buddha. He interests me very much. তখন ঐ প্রবন্ধটি যদিও তিনি শেষ করে উঠতে পারেন নি, তবুও ঐ প্রবন্ধে শাক্যমুনির জন্মেতিহাসের কাব্যময় বর্ণনা ছাড়াও ভারত ও তার দর্শন, তাঁর ইতিহাস সম্পর্কে, সুদূর ভারতের দেশবাসী সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতের ভূমির অংশ রাশিয়ার তিন ভাগের একভাগ। কিন্তু উর্ব্বর ও ফলনশীল। ভারতের ঋতুতে শীতের প্রচণ্ডতা নেই—আছে উষ্ণতার আমেজ। দেড়শত বছর আগে হিন্দুরা স্বাধীন ছিল—স্বাধীন

হিন্দু রাজারা দেশ শাসন করতো—কিন্তু আজকে তারা ইংরেজদের দ্বারা অধিকৃত পরাধীন। এই প্রসংগে তিনি ভারতীয়দের নৈতিক গুণাবলীরও প্রশংসা করেন। পরবর্তীকালে প্রায় কুড়ি বছর বাদে ১৯০৬সালে তিনি Book of Reading-এ বৌদ্ধ দর্শনের মূল তত্ত্ব নিয়ে ছোট্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। মানবহিত ও বিশ্ব কল্যাণের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ বুদ্ধের জীবন ও আদর্শ টলস্টয়কে আকর্ষিত করেছিল। ১৯১০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরে মৃত্যুর দুমাস আগেও বুদ্ধ জীবনের ঘটনার বর্ণনা তাঁর ডায়েরীর পাতায় পাওয়া যায়।

বেদান্ত দর্শনের প্রতি আগ্রহবশতঃ তিনি পাঠ করেছিলেন শংকরাচার্যের দর্শন। প্রকৃতপক্ষে বলা চলে টলস্টয় তাঁর জীবিতকালে ভারতীয় দর্শনের বিবর্তনটুকু অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁর কথামৃতের সহজ, সরলতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯০৬ খ্রীঃ তাঁর বন্ধু ও জীবনীকার মিঃ সেরগিংকো শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ইংরেজী সংস্করণ (মাদ্রাজ থেকে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত) টলস্টয়কে পাঠান—গ্রন্থটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছিলেন, মন্তব্য করেছিলেন চমৎকার কথা, অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঋষি তিনি। এমন কি তিনি রুশ ভাষায় রামকৃষ্ণদেবের বাণী ও গল্পগুলো নিয়ে একটা বই প্রকাশ করবেন ভেবেছিলেন। তিনি প্রায় একশত নীতিগল্প ও বাণী সংকলন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত দুই সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ। টলস্টয়ের অনন্ত ভারত জিজ্ঞাসা এই দুই ভারতীয় সন্ন্যাসীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

বিগত শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে ও বর্তমান শতাব্দীর সূচনাদশকে ভারতীয় মনীষার সঙ্গে টলস্টয়ের যে নৈকট্য তার সূত্রপাত হয়েছিল ১৮৯৬ খ্রীঃ। এক ভারতীয় পণ্ডিত মিঃ এ, কে, দত্ত বিবেকানন্দের একটি বই (নিউ ইয়র্কের বক্তৃতাবলী) টলস্টয়কে পাঠিয়ে দেন ১৮৯৬ খ্রীঃ। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার গাম্ভীর্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তিনি পছন্দ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও টলস্টয়কে দেখবার উদ্যোগ

করেছিলেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সম্ভবপর হয়নি। স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর এক সন্তান তিনিও বেদান্ত প্রচার উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশে বহু পরিক্রমা করেছেন। ফলিত বেদান্তের বাণী শুনিয়ে মানব সভ্যতাকে শান্তির পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু উভয়ের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও উভয়ে মিলিত হতে পারেন নি।

রুশ সাহিত্যিকদের মধ্যে ভারতের প্রতি আগ্রহ ও সহানুভূতি কিছু নতুন নয়। এই আগ্রহ দেখিয়েছেন প্রায় সবাই—পুশকিন, গোগল, নেকরাসভ, গোর্কি কিংবা চেখভ। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, অন্যান্যদের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব শুধু গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। কিন্তু টলস্টয়ের সঙ্গে ভারতের সখ্যতা শুধু গ্রন্থ জগতের মধ্যেই নয়, বরং বলা চলে ভারতের কয়েকজন মনীষী তাঁর সঙ্গে সরাসরিভাবে মিলিত হয়েছিলেন পত্রালাপের মাধ্যমে। টলস্টয় ভারতের পত্রমিতা।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রালাপের সূচনা। আর্য পত্রিকার সম্পাদক এ, রামোশেষন, তিনি সর্বাগ্রে ১৯০১ খ্রীঃ টলস্টয়কে পত্র দেন। নামের সুদীর্ঘ তালিকায় আছেন—(২) মুফতি মহম্মদ সাদিক। ইনি ছিলেন লাহোর জার্নাল ও রিভিউ অব রেলিজিয়ান পত্রিকার সম্পাদক, (৩) বাবা প্রেমানন্দভারতী—The Light of India-র সম্পাদক, (৪) মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট ও The New Reformer-এর সাংবাদিক ডি, গোপাল চেট্টি, (৫) The New Reformer-এর সম্পাদক প্রোফেসর রামদেব, (৬) আবদুল্লা আর মামুন সুরাবর্দি, (৭) দার্শনিক ও পণ্ডিত আর, এম, দাশ শর্মা ও (৮) শ্রী সি, আর, চিট্টস, (৯) বহির্ভারতের বিপ্লবীদ্বয় ডঃ তারকনাথ দাস, (১০) বিপ্লবী উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত।

গান্ধীজী ও টলস্টয়ের পত্রালাপের ইতিবৃত্ত আমাদের কাছেই সুপরিজ্ঞাত। টলস্টয়ের মন্ত্রশিষ্য, সুযোগ্য অনুকারী গান্ধীজীর পক্ষে সেটি ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক কাজ। আফ্রিকার ট্রান্সভালে প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দিনে, তাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের সংবাদ জানালেন

তিনি মানবদরদী টলস্টয়কে। জানালেন তিনি ট্রান্সভালে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কার্যকারিতার কথা। এবং এই বিষয়ে অপ্রতিরোধ নীতির সাধক টলস্টয়ের মত ও পথের নির্দেশ চেয়ে কাতর প্রার্থনা জানালেন। যদিও ট্রান্সভাল থেকে ইয়াসনায়া পলিয়ানার দূরত্ব অনেক, তবুও গান্ধীজীর পক্ষে এটি একটা স্বাভাবিক প্রতিবেদন। কারণ ইতিমধ্যে গান্ধীজী টলস্টয়ের সমগ্র রচনা পড়ে ফেলেছেন, টলস্টয়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Kingdom of God is within you' গান্ধীজীর হৃদয়ে ততদিনে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়ে গেছে, টলস্টয়ের আশী বছরের জন্মোৎসবের পসরা সাজিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজের হাতে গড়া আশ্রমটির নামকরণটির মধ্য দিয়ে—টলস্টয় ফার্ম। কাজেই যে গান্ধীজী টলস্টয়ের প্রদর্শিত আদর্শ অনুযায়ী জীবন গড়ে তুলবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, (১৫ই আগষ্ট ১৯১০এর চিঠি) যিনি ছিলেন টলস্টয়ের অনুগত অনুকারী (৪ঠা এপ্রিল ১৯১০) প্রতিটি চিঠির শেষে যিনি নিজেকে টলস্টয়ের বিশ্বাসী ও একান্ত অনুগত সেবক বলে নিজের নামটি সই করছেন সেই গান্ধীজী, অহিংসার পূজারী গান্ধীজীর পক্ষে টলস্টয়ের কাছে আদেশ, উপদেশ ও সমস্যার সমাধান কামনা করে পত্রালাপ অতি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু বহির্ভারতের বিপ্লবী তারকনাথ দাসের সঙ্গে টলস্টয়ের পত্রালাপ আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

তারকনাথ দাস অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের সক্রিয় সভ্য ছিলেন, ১৯০৫ সালে যিনি দেশ থেকে ফেরার হয়ে আমেরিকায় গদর পার্টি তৈরী করেছিলেন। শুধু তাই নয় জার্মানী ও আমেরিকায় সশস্ত্র বিপ্লবীদের মধ্যে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। এঁদের সক্রিয়তার অন্যতম উদ্যোগ ছিল বিদেশ থেকে ভারতের উপকূলে অস্ত্র পাঠান। ইংরেজ হত্যা, ট্রেজারী লুণ্ঠন, রাজনৈতিক ডাকাতি, বোমা তৈরী করে স্বদেশী যুগে যেসব যুবকেরা ইংরেজ শাসকের শৃঙ্খল শিথিল করেছিল, তারকনাথ দাস তাঁদেরই তালিকার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু নিরস্ত্র সংগ্রামী টলস্টয় বিশ্বাস করতেন

মানবাত্মার মুক্তি ঘটবে প্রেমের নীতির মধ্য দিয়ে। ভারতীয়দের জন্য যাঁর বাণী ছিল—"Do not resist evildoer and take no part in doing so, either in the violent deeds of the administration, in the law courts, the collection of takes, or above all in soldiering and no one in the world will be able to enslave you".

তাঁকে তারকনাথ দাস যিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক চিঠি লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁদের পত্রালাপের পূর্ণ বিবরণ পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করবে। মননশীল ভারতীয়দের কাছে টলস্টয়ের 'এ লেটার টু এ হিন্দু' অতি পরিচিত রচনা। কিন্তু কোন্ চিঠির উত্তরে টলস্টয় এহেন একটি সুদীর্ঘ চিঠি ভারতীয়দের জন্য-লিখলেন সেটা বোধকরি অনেকের কাছে অজানা ছিল। এমন কি বিখ্যাত সমালোচক, সাহিত্যিক পল বীরুকফ পর্যন্ত জানতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের চিঠির উত্তরে ঐটি লেখা। পরবর্তীসময়ে অবশ্য আমাদের ভুল করার আর অবকাশ রইল না। কারণ ১৯৫৭ খ্রী: সোভিয়েত দেশের সাময়িক পত্রিকায় টলস্টয়কে লেখা তারকনাথ দাসের প্রথম চিঠিটি পেয়ে গেলাম।

তারকনাথ দাস ব্রিটিশ স্বৈরতন্ত্র ও দুঃশাসনে বিরক্ত হয়ে দুর্ভিক্ষক্লান্ত শুষ্ক মুখের দিকে তাকিয়ে যে চিঠিটি দিয়েছিলেন সেটির মধ্যে একটি আর্ত আবেদন ছিল, 'ক্ষুধায় মৃতকল্প বহুলক্ষ ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আপনার খ্রীষ্টসভার প্রতি আমার প্রার্থনা আমাদের হয়ে কিছু বলুন।' এবং এরই উত্তরে টলস্টয় সুদীর্ঘবার্তা প্রেরণ করেছিলেন—যেটি তাঁর বিখ্যাত গদ্যরচনার একটি "কোন এক হিন্দুকে লেখা একটি পত্র।" তারকনাথ দাস ও লিও টলস্টয় দুই বিপরীত জগতের অধিবাসী হয়েও একটি বিন্দুতে তাঁরা একত্র হয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, মানবাত্মার দুর্জয় শক্তির প্রতি গভীর আস্থা ও তৎসহ ভারতপ্রেম। তাছাড়া যিনি স্বয়ং 'mirror of the revolution'—তার চালচিত্র বিপ্লবীদেরও চিত্তমুকুরে সহজে অংকিত হবে সে তো স্বাভাবিক।

ভারতাত্মার সঙ্গে টলস্টয়ের সম্পর্কটি দৃঢ়তর হয়ে ছিল তাঁর জীবনের শেষ পাঁচ বছর। এই সখ্যতার বন্ধনটি সৃষ্টি করেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীও ছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আলমামুন আবদুল্লা সুরাবর্দি ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত। সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাবা প্রেমানন্দ ভারতী নাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও ১৯০২ খ্রীঃ আমেরিকা প্রবাসী হয়েছিলেন। 'The white Danger' নামের পুস্তিকা সহ তিনি ১৯০৫ সালে টলস্টয়কে একটি পত্র দেন। সেটি আলাপের সূত্রপাত। ১৯০৭খ্রীঃ তাঁর দ্বিতীয় পত্রের সঙ্গে টলস্টয় পান তাঁর একটি গ্রন্থ "Shri Krisana—the Lord of love।" টলস্টয় গ্রন্থটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন, তাঁর ডায়েরীতেও এ বইটি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য রেখে গেছেন। রুশ ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী কিছু অনুবাদও করেছিলেন-Book of Reading-এর জন্য। পরে ১৯০৮ খ্রীঃ যখন তিনি 'এ লেটার টু এ হিন্দু', লেখেন তখন ঐ বইটি থেকে অনুদিত শ্রীকৃষ্ণের বাণী চিঠির প্রারম্ভভাগে উৎকীর্ণ করেন। গ্রন্থটি এইভাবে বিখ্যাত হয়ে উঠল। বাবা প্রেমানন্দ ভারতী The Light of India-বলে একটি পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। তিনি টলস্টয়ের আদর্শ ও মহানুভবতা দ্বারা এতই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে তিনি প্রকাশনার ব্যাপারে টলস্টয়ের সক্রিয় সাহায্য চেয়েছিলেন এবং প্রয়োজনে তিনি পত্রিকার নামটি পরিবর্তন করতে রাজী ছিলেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামে পত্রিকাটি সমগ্র বিশ্বে শান্তির দূতীর কাজ করবে এই ছিল তাঁর আশা। ১৯০৭ খ্রীঃ তিনি দেশে ফিরে আসার পরও পত্রিকাটি চালাতেন। টলস্টয় আমৃত্যু এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যা ইয়াসনায়া পলিয়ানায় বসে পাঠ করতেন। সেই সঙ্গে ভারতীয়দের সমসাময়িক চিন্তাধারা, জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা, সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হতেন।

আর এক বঙ্গ মনীষী আল মামেন আবদুল্লা সুরাবর্দি যিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পি এইচ ডি। আইনজ্ঞ

ছিলেন তিনি। সাংবাদিকতা ছিল তাঁর নেশা। লণ্ডন শহর থেকে প্রকাশ করতেন একটি পত্রিকা The Light of the World। সুরাবর্দি পরিবারের অনেকেই আইন ব্যবসায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। স্যার রহিম সুরাবর্দি কলকাতার হাইকোর্টে বিচারপতি ছিলেন দশ বছর। আর জেটল্যাণ্ড যখন গবর্ণর ছিলেন তখন রহিম সুরাবর্দি ও স্যার আবদুল্লা সুরাবর্দি দুজনেই বিধানসভার সদস্য ছিলেন। অখণ্ড বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী শহিদসুরাবর্দি ছিলেন আবদুল্লা সুরাবর্দির ভাইপো। আবদুল্লা সুরাবর্দি ছিলেন 'একজন মাতব্বর পলিটেশিয়ান।' তাঁর First Steps in Muslim Jurisprudence (Consisting of excerpts from Bakurat-at-said of Ibun Abuzayd) গ্রন্থটি সরাসরি আরবি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে মুসলমান প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য জাম্বিয়ার গবর্ণর স্যার জর্জ চার্দিন অনেক চেষ্টা করেছিলেন—বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করেছেন সুরাবর্দি। পশ্চিম আফ্রিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে বিচারের নামে প্রহসন হতো। সুরাবর্দি তাই মুসলমান আইনগুলো বিশেষতঃ বিবাহ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনগুলো নিয়ে আলোচনা করলেন যাতে ইংরেজরা আর আফ্রিকাবাসীদের ঠকাতে না পারে। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তিনি ছিলেন সমর্থক। স্বদেশপ্রীতি ও তৎসহ স্বৈরাচারী ইংরেজদের প্রতি তাঁর ঘৃণাবশতঃ স্বভাবতঃই তিনি যুদ্ধ-বিরোধী প্রেমের উপাসক টলস্টয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন সহজে। স্বদেশে ফিরে এসে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর তিনি মহতী টলস্টয়কে একটি পত্র দেন। ঐ পত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে চিন্তাজগতের নানা মতবাদ বিনিময় ছাড়াও এই চিঠিতে সুরাবর্দি টলস্টয়ের রেসারেকশন ও ও অন্যান্য অমর সাহিত্যাবলী বাঙলাভাষায় অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন। তিনি টলস্টয়ের একটি জীবনী লিখবার জন্য তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকাও চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। সুরাবর্দি তাঁর

উপন্যাস অনুবাদ করার ও জীবনী লেখার অনুমতি পেয়েছিলেন। মিঃ চ্যেৎকভ টলস্টয়ের কয়েকটি বই ও তাঁর একটি ফটোগ্রাফ সুরাবর্দিকে পাঠিয়ে দেন। ১৯০৮ খ্রীঃ ৯ই জানুয়ারীর একটি চিঠিতে তিনি টলস্টয়কে প্রাপ্তি সংবাদ জানান। এই পরিবারের প্রায় সবাই ছিলেন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অনুরাগী। সাহেদ সুরাওয়াদি' আবদুল্লা সরাওয়াদি'র আর এক ভাইপো। তিনি ইংরেজী প্রবন্ধ সাহিত্য ও কবিতা রচনা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। কবি বিষ্ণু দের ভাষায় বলা চলে 'নাগরিকোচিত বৈদগ্ধ্য' তাঁর ছিল। ইনিও রুশ দেশে কিছুকাল ছিলেন। প্রবীণ বয়সে বঙ্গদেশে ফিরে আসেন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ইংলণ্ড ও ইউরোপে বহুকাল বসবাস করার জন্য ইনি সাহিত্য সেবার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর খুল্লতাত আবদুল্লা সুরাবর্দি'র ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই দক্ষতা ছিল। আর ঐ কারণেই জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুল্লা সুরাবর্দি' টলস্টয়ের বিশ্বকে বঙ্গভাষার অনুবাদের গবাক্ষপথ দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেই বাঙলা ভাষায় টলস্টয়ের জীবনচর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুরেশ সমাজপতি টলস্টয়ের জীবনের বিচিত্র দিক 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর গল্পের প্রথম অনুবাদও (চল্লিশ বৎসর ১৩১০ বঙ্গাব্দ—অনুবাদক চণ্ডীচরণ সেন) প্রকাশিত হয়ে গেছে। কাজেই একথা যেন মনে না হয় যে সুরাবর্দিই টলস্টয়ের জীবনী রচনা ও অনুবাদকাজে প্রথম আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সুরাবর্দি' লিখিত টলস্টয় সংক্রান্ত কোন পাণ্ডুলিপি কিংবা প্রকাশিত কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি। গবেষণা এখনও চালিয়ে যাচ্ছি। জ্ঞাতব্য তথ্য হাতে এলে পাঠকদের সুযোগ মত জানাব। সুরাবর্দি' মুসলমান দর্শন সম্পর্কেও উৎসাহী ছিলেন। তাঁর The Sayings of Mahomet-এইটি তিনি টলস্টয়কে পাঠিয়েছিলেন। টলস্টয় বইটি পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন। তাঁর Circle

of Reading-গ্রন্থে ঐ বইটি থেকে কিছু বিবৃতি তিনি সংকলন করে-ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীঃ টলস্টয়ের আশি বছরের জন্মদিনের উৎসব খুব ঘটা করে পৃথিবীর সর্বত্র পালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রকাশিত The Internationl Tolstoy's Almanac-এ সুরাবর্দি' প্রশংসাপূর্ণ একটি প্রবন্ধ পাঠান। অসুস্থ টলস্টয় সেটি পড়েছিলেন। মিঃ চ্যেৎকভকে দিয়ে সৌজন্যপূর্ণ প্রত্যুত্তরও পঠিয়েছিলেন।

সেইযুগে আর একজন বাঙালী চিন্তাবিদ উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের প্রসংগ উল্লেখ করে প্রসংগান্তরে যাব (তিনি ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের ভাইপো ও কমিউনিষ্ট নেতা রজনী পাম দত্তের পিতা) তাঁর সঙ্গেও টলস্টয়ের পত্রালাপ হয়েছিল। ১৯৬২ খ্রীঃ লেবার মান্থলি পত্রিকায় ডিসেম্বর সংখ্যায় তাঁদের পত্রাবলীর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। টলস্টয়ের সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্ক যে শুধু চিঠিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তবে চিঠিপত্র ভাববিনিময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। চিঠির মধ্যে দিয়ে দূরের মানুষ কাছের হয়। নিজেকে সহজ করে আন্তরিক করে কাম্যজনের কাছে প্রকাশ করার একমাত্র হাতিয়ার চিঠি। টলস্টয়ের চিঠিগুলির একটা বিশেষত্ব আছে। ব্যক্তিবিশেষকে লেখা চিঠি শুধু ব্যক্তিগত থাকে না। কারণ তিনি যখন লেখেন তখন তাঁর সামনে থাকে বর্তমান পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষ আর ভাবীকালের অনাগত মানব সন্তান। তাই চিঠিগুলিকে Collective letters বলা চলে। স্বভাবতঃ এদের আকৃতিও সুদীর্ঘ প্রবন্ধসুলভ। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল মূলত আলোচ্য চিঠিগুলির মাধ্যমে।

শুধু ভারতের বিপ্লবীদের কছে নয়, সাহিত্যিকদের কাছেও টলস্টয় অত্যন্ত প্রিয়জন। বোধকরি টলস্টয় ও কার্লমার্কস এই দুই বিদেশীর প্রভাব আমাদের দেশের সাহিত্যের উপর সর্বাধিক। সমকালে জীবিত ছিলেন বাঙালী সাহিত্যের যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। টলস্টয়ের প্রসংগ ও প্রভাব দুজনের কারও পক্ষেই এড়িয়ে যাওয়া

সম্ভব হয় নি। বরং পাশ্চাত্য সমালোচকের চোখের 'Rabindra Nath is a kind of Hindoo Tolstoy রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। অনেক সমালোচক আবার শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের রূপ ও রীতিতে টলস্টয়ের প্রভাব খুঁজে পান। রবীন্দ্রনাথের চোখেও টলস্টয় ছিলেন বিরাট-পুরুষ। ইউরোপের গুরুর আসনে টলস্টয়কে বসিয়ে তাঁর শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছেন। দ্বিধাহীন চিত্তে টলস্টয়ের সৃষ্টির বিশালতা, বৈচিত্র্য ও সর্বজনস্পর্শী ভাবগ্রহীতা দেখে কবি বিস্মিত হয়েছেন বারবার। কবির 'রাশিয়ার চিঠি' সেই সাক্ষ্য বহন করছে। ভাবতে বিস্ময় জাগে বঙ্কিমচন্দ্র ও টলস্টয় একই শতাব্দীতে বিচরণ করেছেন—কিন্তু পরস্পর মধ্যে পরিচয় ছিল না, তবুও কোথাও যেন দুই মহৎ শিল্পীদ্বয়ের একটা ঐক্য আছে। শিল্প ও নীতির দ্বন্দ্বে উভয়েরই চিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত। টলস্টয়ের অ্যানা কারেনিনার আদল বংকিমের শৈবলিনী ও কুন্দ নন্দিনীর মাঝে খুঁজে পেলে পাঠকদের দোষ দেওয়া যায় না। টলস্টয় পুনরুজ্জীবনের যে পথ দেখিয়েছেন 'রেসারেকশন' উপন্যাসে, বংকিম ভিন্নপথে একই লক্ষে পৌঁছেছেন 'ত্রয়ী' উপন্যাসে।

ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যেও টলস্টয়ের প্রভাব অনস্বীকার্য। হিন্দীসাহিত্যের সবচেয়ে খ্যাতিমান সাহিত্যিকও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'প্রেম-প্রভাকর' গ্রন্থে প্রেমচাঁদ অনূদিত টলস্টয়ের তেইশটি ছোটগল্প সংগ্রহ করা আছে। ভারতে টলস্টয় সর্বাধিক প্রচারিত। অর্থাৎ ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়—বাঙলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, অসমীয়া, কানাড়ী, মালয়ালাম, পাঞ্জাবী ও উর্দু ভাষায় তাঁর গ্রন্থের অনুবাদ ও তাঁর জীবন ও সাহিত্যের উপর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লেখা টলস্টয়ের গ্রন্থের একটি তালিকা সম্প্রতি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে প্রকাশিত হয়েছে। টলস্টয়ের রচনার অনুবাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশত। আর তাঁর জীবন ও রচনার উপর আলোচনা গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি।

এছাড়া ছড়িয়ে আছে পত্র-পত্রিকায় অনুবাদ ও সমালোচনা। এই জাতীয় পরিসংখ্যা প্রমাণিত করে ভারতে তিনি সর্বজনের সর্বাধিক প্রিয়তম সাহিত্যিক।

ভারতের ইংরেজী সাহিত্যিক মুলক রাজ আনন্দ বলেন-"There is no man on earth who would not bow down before the genius of Tolstoy"। সত্যিই ভারতের অনেক কর্মবীর ও সাহিত্যিক যেমন বিশেষভাবে উমাশংকর যোশী, বেনারসী দাস চতুর্বেদী তাঁর পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন। সাহিত্যেও প্রায় এক শতাব্দী ধরে ভারত টলস্টয়-অনুরাগী।

টলস্টয় ভারতের মিতা, সখা। কারণটি মহামতি লেনিনের ভাষায় বলা যাক—"On the one hand, we have the great artist, the genius who has not only drawn incomparable pictures of Russian life but has made first class contributions to world literature. on the other hand, we have the landlord of sessed with Christ, on the one hand, the remarkably power ful, forthright and sincere protest against social falsehood and hypocrisy; and on the other, the Tolstoyan"

নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তিদূত প্রেমপূজারী টলস্টয়ের সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সখ্যতা অনুভব করে। সকলের কথা একটি গ্রন্থে বলা সম্ভব নয়। শুধু কয়েকজনের কথাই আমি পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করেছি। সময়ানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, তারকনাথ দাস, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে টলস্টয়ের সম্পর্কটি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় দুই সন্ন্যাসী ও লিও টলস্টয়

লিও টলস্টয়ের ভারতভূমির প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল অপরিসীম। ভারত সফর টলস্টয় করেন নি—কিন্তু ইয়াসনায়া পলিয়ানায় বসেই সুদূর ভারতবর্ষ তাঁর জ্ঞান ও হৃদয়ের রাজ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় দর্শনের সনাতন ঐতিহ্যের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পাঠক। একদিকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও জাতকের গল্প অপরদিকে উপনিষদ, গীতা, বেদ, বেদান্ত ও বিশেষত বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি যথার্থই ভারতপথিক। বৌদ্ধ দর্শনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন টলস্টয়। রোঁমারোঁলা "টলস্টয়ের জীবনী" গ্রন্থে জানিয়েছেন—যখন টলস্টয় উনিশ বছরের যুবক, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কাজান হাসপাতালে থাকাকালীন তিনি এক বৌদ্ধ লামার সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর কাছেই বুদ্ধের মূলবাণীগুলো সম্পর্কে অবহিত হন। শান্তি ও মৈত্রী বৌদ্ধ দর্শনের মূল সূত্র। পরবর্তীকালে টলস্টয়ের নির্বিরোধনীতির মূল সূত্রটি হয়তো বুদ্ধের মৈত্রী ও শান্তির বাণীর মধ্যে গুহাহিত ছিল। বেদান্ত দর্শনের প্রতি আগ্রহবশতঃ তিনি পাঠ করেছিলেন শংকরাচার্যের দর্শন। প্রকৃতপক্ষে বলা চলে টলস্টয় তাঁর জীবিতকালে ভারতীয় দর্শনের বিবর্তনটুকু অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন রামকৃষ্ণ দর্শনের সূচনা ও বিস্তার। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" নয়—বরং প্রতিটি মানুষের মাঝেই ব্রহ্ম বিরাজিত—নর-নারায়ণ বনের বেদান্ত ঘরের বেদান্তে রূপান্তরিত ছিল। 'যত মত তত পথ'—ঈশ্বর অনুসন্ধানের পথটিও সহজ। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনের ও তাঁর প্রচারিত ধর্মের সহজ, সরল, অনাড়ম্বর দিকটি টলস্টয় পছন্দ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতও তাঁর কাছে

অমৃতের মর্যাদা পেয়েছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর বন্ধু ও জীবনীকার পি, এ সেরগিংকো শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ইংরেজী সংস্করণ (মাদ্রাজ থেকে ১৯০৫ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়েছিল) টলস্টয়কে পাঠান। গ্রন্থটি পাঠান্তে তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গদের—"চমৎকার কথা, পঞ্চাশ বছর আগে রামকৃষ্ণ মারা গেছেন। অসাধারণ বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ ঋষি তিনি।" কথামৃতের কিছু অংশ তিনি জোরে পাঠ করে শোনালেন তাঁদের। এমন কি তিনি রুশভাষায় রামকৃষ্ণদেবের বাণী ও গল্পগুলো নিয়ে একটা বই প্রকাশ করবেন ভেবেছিলেন—এই উদ্দেশ্য নিয়ে রামকৃষ্ণদেবের প্রায় একশত নীতিগল্প ও বাণী সংকলন করেছিলেন। এই শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত দুই সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ। টলস্টয়ের অনন্ত ভারতজিজ্ঞাসা ও রামকৃষ্ণ প্রীতি এই দুই ভারতীয় সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলো। নিউইয়র্কে প্রদত্ত বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি পড়েছেন। আর স্বামী অভেদানন্দের দর্শন ও চিন্তার সংগে পরিচিত হয়েছেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। উনিশ বিশের এই যুগসন্ধি ক্ষণটি ভারতীয়দের জীবনে পরম শুভলগ্ন। এই সময়ই টলস্টয়ের সংগে ভারতীয়দের চিন্তাবিদ্‌দের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের মনীষীদের সংগে পত্রালাপের অধিকাংশই এইযুগে লেখা। গান্ধীজী, তারকনাথ দাস কিংবা উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত সকলের সংগে টলস্টয়ের সম্পর্ক এইকালেই গড়ে উঠেছিল।

১৮৯৩-১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ও লণ্ডনে উদাত্ত বাগ্মিতার সহায়তায় বেদান্তের বাণী ও ভারতীয় যোগকে সহজ সুবোধ্য করে পাশ্চাত্যবাসীর কাছে তুলে ধরলেন। বেদান্তের মাধ্যমে আর্যচিন্তার ফসল আমেরিকা ও ইউরোপের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য বিবেকানন্দ বিশ্বপরিক্রমা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে প্রচারিত ধ্রুববাদ (Positivism) বা উপযোগবাদ (utilitarianism) মানুষের কল্যাণে স্বীকৃত হলেও সে নিতান্তই

জীবধর্মী মানুষের কাজে নিযুক্ত আছে—বেদান্ত প্রতিপাদ্য—ব্রহ্ম-তত্ত্বই যে আধুনিক বিশ্বের একমাত্র পরিত্রাণের পথ—এটি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়—যে কোন জিজ্ঞাসুচিত্তের শান্তি আনতে পারে বেদান্ত—পাশ্চাত্ত্যে স্বামীজী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দ্বারা এই সত্যটিই বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ পরিক্রমা করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর প্যারিস কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তৃতা দেন। এখান থেকেই বিবেকানন্দের সংকল্প ছিল ইয়াসনায়া পলিয়ানা যাবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। রোমারোঁলা জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রতি কৌতু-হল ছিল বিবেকানন্দের—ব্যক্তিগতভাবে রাশিয়াকে দেখবার জন্য তিনি সেখানে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার ইউরোপ পরিভ্রমণে গিয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন নি। এই দুই মনীষীর সংগম হয়নি বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন "...He was not able fo bring together the two Chairvoyants, the two religious geniuses of Europe and Asia."

এর পরে অবশ্য ২৫ শে জানুয়ারী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে এলেন। এবং এরই পরের বছর ১৯০২ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই তিনি দেহত্যাগ করেন। জানিনা বিবেকানন্দ যদি স্বল্পায়ু না হতেন হয়তো বা রাশিয়া ভ্রমণটিও তাঁর জীবন ইতিহাসে স্থান পেত। আর টলস্টয় ও বিবেকানন্দের মনীষার প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতের ইতিহাস ভিন্নধারায় প্রবাহিত হোত। স্বামী বিবেকানন্দ টলস্টয়কে জানতেন কিনা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। তবে যে বিবেকানন্দ নানান দেশ বিদেশের বহু মনীষার (উলিয়ম জেমস, নিকোলো টেসলা, মাক্সমুলার, রোঁমারোঁলা, এডওয়ার্ড কার্পেন্টার, অধ্যাপক মার্লো, স্টার্ডি, মিসমুলার ও গডইইন) সংগে যুক্ত হয়েছিল—তাঁর অন্তরে নিশ্চয়ই তৎকালীন রুশ মনীষী টলস্টয়ের (যিনি সমকালীন ভারতের বন্ধু এবং প্রেম ও অহিংসা, সত্য ও নীতিবোধের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের

আত্মা জয় করেছেন) সংগে মিলিত হবার বাসনা থাকা স্বাভাবিক তাছাড়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই দক্ষিণ ভারতীয় সংবাদপত্র 'মাদ্রাজ মেলে' টলস্টয় সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। প্রবাদগুলি—(1) Count Tolstoy's latest utterances (1894; Dec 24) (2) Count Tolstoy and His critics (1895, Feb 4) (3) A Russian Prophet (1895, March 23), (4) Count Tolstoy's Politics (1896, Nov 27)

পত্রিকাটি ইংরেজ পরিচালিত হলেও শিক্ষিত দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে মোটামুটিভাবে প্রচলিত। অবশ্য এই সময়টা (১৮৯১-১৮৯৭/ ১৫ জানু) তিনি আমেরিকা ও ইউরোপে পরিভ্রমণ করছিলেন। কিন্তু জ্ঞাতব্য এই ইতিমধ্যে টলষ্টয়ের মতবাদমূলক সব রচনাগুলিই প্রকাশিত হয়ে গেছে (আমি কী বিশ্বাস করি,—১৮৮৪; কী তা হলে কর্তব্য ১৮৮৬; জীবন প্রসংগে, ১৮৮৭; ভাগবত রাজ্য তোমার অন্তরে, ১৮৯৩; শিল্প কী,—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে) এবং টলস্টয়ও পশ্চিমী দুনিয়াতে সুপরিজ্ঞাত হয়ে উঠেছেন—কারণ এই সময়ই তরুণ গান্ধীজী লণ্ডনে থাকাকালীন টলস্টয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কাজেই আমার বক্তব্য বিবেকানন্দ স্বদেশে বা বিদেশে যেখানেই থাকুন না কেন তিনি টলস্টয় সম্পর্কে কিছুটা জানতেন সম্ভবতঃ —কিন্তু কোথাও তাঁর সম্পর্কে বিবেকানন্দ আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে জানা যায়নি। বিবেকানন্দ রুশদেশ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ আছে। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রমজীবী মানুষের জন্য যে নতুন পৃথিবীর ও নতুন সভ্যতার স্বপ্ন দেখেছিলেন—এই স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠবে সর্বপ্রথম রাশিয়াতে এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন। "তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল সেই দেশগুলোর ওপর যেখানে প্রথম শূদ্র (সর্বহারা) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন সার্থক হবে। এই কারণেই তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, সম্ভবত রাশিয়াতেই পৃথিবীর প্রথম শূদ্ররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বামীজীর এই

ভবিষ্যদ্বাবাণী সফল হল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়াতে শ্রমিক ও কৃষকের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা।"

অপরদিকে লিও টলস্টয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দেই বিবেকানন্দের দর্শনের সংগে পরিচিত হয়েছেন। দিলীপকুমার রায়ের বিশিষ্ট বন্ধু এ, কে দত্ত টলষ্টয়কে বিবেকানন্দের একটি বই পাঠান। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকার বিভিন্ন সভায় যে সব বক্তৃতা দেন তারই সংকলন এই গ্রন্থটি বইটি পাঠকরে টলস্টয় সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ খ্রীঃ লিখলেন—"ভারতীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও জ্ঞানের উপর একটা মনোমুগ্ধকর বই।" এই গ্রন্থের প্রেরককে তিনি একটি চিঠি দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকার করেন—

প্রিয় মহাশয়—

আপনার প্রেরিত চিঠি ও বইটির (রাজযোগ) জন্য ধন্যবাদ। এই গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান ও আমি এর থেকে কিছু শিক্ষা লাভ করেছি। জীবন নীতির মহিমান্বিত এই সহজ সরল সত্য থেকে প্রায়ই মনুষ্যধর্ম পিছিয়ে পড়ে কিন্তু কখনই ঐ জীবনসত্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়নি।

ইতি

আপনার লিও টলস্টয়

শ্রীদিলীপ কুমার রায়ও তাঁর 'তীর্থংকর' গ্রন্থে এই পত্রটির বিষয়ে জানিয়েছেন—"...টলস্টয় যে শেষ জীবনে বিবেকানন্দের লেখায় মুগ্ধ হয়েছিলেন, তা আমি জানি। কারণ আমার এক বাঙালী বন্ধু টলস্টয়কে তাঁর শেষজীবনে বিবেকানন্দের রাজযোগ বইখানি পাঠিয়েছিলেন। পড়ে টলস্টয় তাঁকে লেখেন যে, এ যুগের মানুষ নিষ্কাম আধ্যাত্মিক চিন্তায় এর উর্ধ্বে কখনও উঠেছে কিনা সন্দেহ।"

টলস্টয় বিবেকানন্দের লেখা দ্বিতীয় গ্রন্থ যেটি পড়লেন সেটির নাম Speeches of Articles। আই, এফ নাঝিভিন তাঁকে ১৯০৭সালে বইটি পাঠান। নাঝিভিন যখন তাঁকে বইটি পাঠাবেন কিনা জানতে

চেয়ে চিঠি দেন—টলস্টয় তার উত্তরে লেখেন—"ব্রাহ্মণের লেখা বইটি পাঠিয়ে দিন—এই সব বই পড়ে আনন্দ পাওয়া যায়—আত্মা প্রসার লাভ করে।" এর পর টলস্টয় বিবেকানন্দের আরও দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন The Hymn of the Peoples আর God and Man। এই দুটি প্রবন্ধ সম্পর্কেও তিনি 'অসাধারণ ভাল' বলে মন্তব্য করেন। (এই দুটি প্রবন্ধ I, F Nazhivin ১৯০৮ খ্রী: 'Voices of the Peoples' গ্রন্থে স্থান দিয়েছিলেন)।

টলস্টয় স্বামী বিবেকানন্দের কোন গুণটির দ্বারা আকর্ষিত হয়েছিলেন—স্বামীজীর চিন্তার গভীরতা, আবেগাত্মক সুদৃঢ় প্রত্যয় ও রচনাশৈলীর বুদ্ধিদীপ্ত চমৎকারিত্বে টলস্টয় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ টলস্টয়ের মতই পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া সভ্যতার বিরুদ্ধে ছিলেন। টলস্টয় বিজ্ঞানের উন্নতি, শিল্প উন্নতির ও সামরিক শাসনের বৈপরীত্যে পল্লীতে স্বয়ংশাসিত কৃষিভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও সে পথের অনুসন্ধান করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে যখন ইংরেজী সভ্যতার মোহে স্বদেশবাসী প্রায়ান্ধ—বিবেকানন্দের স্বচ্ছ দৃষ্টি এই মোহজাল ছিন্ন করে প্রত্যক্ষ করল প্রকৃত সত্য—"আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই পাশ্চাত্য সভ্যতা টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে, যদি তার কোনো আধ্যাত্মিক ভিত্তি না থাকে। মানুষকে তরবারির সাহায্যে শাসন করবার চেষ্টা অর্থহীন।" "একমাত্র উপনিষদের ধর্মই ইউরোপকে রক্ষা করতে পারে।"

টলস্টয়ের তীব্র ঘৃণা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'আমি নীরব থাকতে পারি না' ও 'লেটার টু এ হিন্দু' রচনার মধ্য দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও জাতীয় ভাবাদর্শে পুষ্ট বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী।..."আজ ইউরোপ অস্থিরমতি। কোনদিকে যাবে তা জানে না। বৈষয়িক অত্যাচার চরম। দেশের ধন এবং ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের করতলগত, যারা কোন কাজ করেনা, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষকে তারা কৌশলে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগায়। এই

ক্ষমতা যাদের তারা পৃথিবীতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে পারে। তোমরা শাসনতান্ত্রিক সরকার, স্বাধীনতা, পার্লামেন্ট ইত্যাদি সম্পর্কে যত কথা শোনো, তা সমস্তই পরিহাস মাত্র।" (বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী (ইং) ৩য় খণ্ড, পৃ ১৫৯)।

দরিদ্র, অবহেলিত, নিপীড়িত নরনারীর সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য স্বামীজী সকলকে আহ্বান করেছিলেন। সমস্ত অবনতির অবসান চাই, অস্পৃশ্যতা থাকবে না, কেউ ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণিত হবে না। তাঁরা সকলেই নারায়ণ। দেশের মানুষ গঠনের ব্রতই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন আজকের দরিদ্র নিপীড়িত অবহেলিত শ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘটবে—এমন একসময় আসবে যখন শূদ্র শ্রেণীর স্বীয় শূদ্রত্ব নিয়েই অভ্যুত্থিত হবে। আচণ্ডাল জনসাধারণকে তিনি বিপ্লবের আহ্বান জানালেন—

"নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুণাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।·········এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। ······এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে······ এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন।"

(বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮২)

তিনিই সর্বপ্রথম সমগ্র বিশ্বে দরিদ্র খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে ভাববাণী করেছিলেন—"এই নবশক্তির অরুণোদয়ের আলোক পাশ্চাত্ত্য জগতে ইতিমধ্যেই উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছে—সোস্যালিজম্, নৈরাজ্যবাদ, এনার্কিজম্ অর্থাৎ রাষ্ট্রের চলতি অবস্থার সর্বাত্মক ধ্বংস—সাধনান্তর পুনর্গঠনপ্রয়াসী এবং অন্যান্য মতবাদ আগামী দিনের সমাজ বিপ্লবেরই পুরোধা।" তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল যখন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পর তথায় শ্রমিক গভর্ণমেন্ট

প্রতিষ্ঠিত হয়। টলস্টয়ের জীবনচর্যায় ও রচনাবলীতে আগামী বিপ্লবের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। মহামতি লেনিন টলস্টয়কে মনে করেছিলেন—'Mirror of the Russian Revolution'. "Tolstoy is Great as the Spokesman of the ideas and sentiments that emerged among the millions of Russian peasants at the time the bourgeois revolution was approaching Russia. Tolstoy is original, because the sum total of his views, taken as a whole, happens to express the specific features of our revolution as a peasant bourgeois revolution."
(V. I. Lenin)

কাজেই দেখা যাচ্ছে উভয় মনীষীর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা ছিল প্রগতিশীল। অপরদিকে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা, মানুষের দুর্জয় আত্মিকশক্তি ও সর্বোপরি সত্য ও নীতিবোধ উভয় মনীষীর আত্মিক মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এই দুই প্রখ্যাত মনীষার সাদৃশ্য তাই সমকালীন অনেকের চোখেই প্রতিভাত হয়েছিল।

শিষ্যা ভগিনী ক্রিষ্টিনের চোখে স্বামী বিবেকানন্দের মানসিক মুক্তিলাভের আর্তি টলস্টয়ের প্রচণ্ড সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষার সদৃশ বলে ধরা পড়েছিল। "সানডে টাইমস"এর প্রতিনিধির মনে হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের মতামতগুলো টলস্টয়ের মতো। কি কথা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে। স্থানটি ছিল লণ্ডন; কাল—১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দ; পাত্র—'সানডে টাইমস'-এর সাংবাদিক ও বিবেকানন্দ।

সাংবাদিক—আপনার শিক্ষা কি ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা?

স্বামীজী—সকলপ্রকার ধর্মের সারভাগ শিক্ষা দেওয়া বললে বরং আমার প্রকৃত শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে একটা স্পষ্টতর ধারণা হতে পারে।······আমি রামকৃষ্ণদেবের একজন শিষ্য। তাঁর জীবন ও উপদেশ আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।······তাঁর উপদেশের মূল সত্য এই যে সমগ্র জগৎ প্রেমবলে পরিচালিত।······

ভারত ধর্মাবরণের স্বাধীনতা বিষয়ে শান্তি ও মৃদুতারূপ যথার্থ বীর্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। যুদ্ধ, প্রচণ্ড আঘাতে শক্তি প্রকাশ—এইগুলি ধর্মজগতের দুর্বলতার চিহ্ন।

সাংবাদিক—আপনার কথাগুলি টলস্টয়ের মত লাগছে। ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে হয়তো এই মত অনুসরণীয় হতে পারে—কিন্তু সে সম্বন্ধেও আমার নিজের সন্দেহ আছে, সমগ্র জাতির ঐ নিয়মে বা আদর্শে চলা কিভাবে সম্ভব।

বিবেকানন্দ—জাতির পক্ষেও ঐমত অতি উত্তমরূপে কার্যকর হতে দেখা যায়, ভারতের কর্মফল ভারতের অদৃষ্ট অপর জাতিগুলি কর্তৃক বিজিত হওয়া। কিন্তু আবার সময়ে ঐসকল বিজেতাকে ধর্মবলে জয় করা।"

(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯)

এই উদ্ধৃত অংশটুকু এই প্রবন্ধে সংযোজন করার উদ্দেশ্য এই নয় যে আমি প্রমাণ করতে চাইছি বিবেকানন্দ ও টলস্টয় এক ভাবের ভাবুক ছিলেন—কিংবা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঋষি বা মনীষীদের প্রতিভায় সর্বত্রই যেন একটা ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। টলস্টয় সাগ্রহে বিবেকানন্দের রচনা ও দর্শন পাঠ করেছিলেন সত্য—সমালোচনাও করেছিলেন। বিবেকানন্দের দর্শনের অতীন্দ্রিয়বাদ কিংবা ভাষার বাগাড়ম্বর ও শাব্দিক শূন্যতা তাঁকে পীড়িত করেছিল। সবচেয়ে তিনি অপছন্দ করেছিলেন বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক পরিবর্তনটুকু। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত Swami Vivekananda: Patriot Prophet গ্রন্থে জানিয়েছেন—টলস্টয় বিবেকানন্দ ও অন্যান্যকে বুদ্ধ ও কৃষ্ণের দেশের লোকদের অহিংস পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য দায়ী করেন। এই মতটি টলস্টয় বহি-র্ভারতের বিপ্লবী তারকনাথ দাসের একটি চিঠির উত্তরে জানান। তবে এটি সত্য যে বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য অনেকেই সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদান করেছিলেন পরবর্তীকালে।

তবুও রামকৃষ্ণদেব টলস্টয়ের কাছে 'মৌলিক চিন্তাসম্পন্ন জনগণের মানুষ' কিংবা 'বিবেকানন্দের দর্শন মনের প্রসারতা বাড়িয়ে দেয়।' ভারতীয় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দর্শনে ঋষি টলস্টয় কখনও সনাতন ভারতের বৈদিক চিন্তার প্রতিফলন দেখেন, কখনও বা আপন ধ্যান-ধারণার সংগে সাযুজ্য অনুভব করেন। কারণ বিবেকানন্দ প্রচারিত রাজযোগে অহিংসার কথা বলা হয়েছে। অহিংসা অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম আর নেই। জীবের প্রতি এই অহিংসাভাব থেকে মানুষ যে সুখ লাভ করে, তার চেয়ে উচ্চতর সুখ আর নেই। সত্য দ্বারাই আমরা কর্মের ফল লাভ করি—সত্যেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। যথার্থ কথনকেই 'সত্য' বলে। অহিংসা অর্থাৎ সকলকে এমনকি মহাশত্রুকেও ক্ষমা করা ও সত্য ধর্মে স্থির থাকা রাজযোগীদের ব্রতস্বরূপ।

এবার রামকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত অপর এক সন্ন্যাসী—স্বামী অভেদানন্দের প্রসংগে আসছি। ১৮৯১ থেকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একটানা তিনি প্রথমে লণ্ডন ও পরে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অধ্যাপক জেমস্, অধ্যাপক রয়েস, ডাঃ জেনস্, ল্যাজম্যাজ প্রমুখ চিন্তানায়কগণের সংগে বিভিন্ন স্থানে আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছেন ও বেদান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেদান্তের উপর একটি বক্তৃতা দেন। বক্তব্য ছিল—মানবজীবনের সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করতে পারবে বেদান্তের আদর্শ। বেদান্ত মানুষকে পথ দেখাবে, চলার পথকে সুগম করবে, বিশ্বজনীন ইচ্ছার সঙ্গে মানুষকে করবে ঐক্যবদ্ধ। আমরা দুঃখ শোকে যেন আচ্ছন্ন না হই—এদের হাত থেকে আমরা মুক্ত কোনদিনও হতে পারবো না। মৃত্যুকে জয় করার পদ্ধতি বেদান্তই শিখিয়ে দেয়। বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আমাদের আত্মাকে নিঃস্বার্থ পবিত্র করে তোলা, আমাদের জীবনকে আদর্শায়িত করা আর মানুষকে অনন্ত সত্যের জন্য সংগ্রামে ব্রতী করা। "এই জগতে যে অসীম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনসত্তাগুলি রয়েছে সেগুলি বিবর্তনক্রমে সীমা থেকে অসীমে চলেছে। আমাদের

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ইচ্ছা—সেই বিরাট ইচ্ছাশক্তিরই অণু—সমগ্র সৌরমণ্ডলকে পরিচালিত করছে। স্বামী অভেদানন্দের মন্ত্র ছিল প্রেমের মন্ত্র। প্রেমের মন্ত্রে মার্কিনী মর্মজীবন জয় করে নেন। প্রকৃতপক্ষে বিবেকস্বামী বা অভেদস্বামী বিদেশে ঠিক হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য যান নি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা—"যত মত তত পথ, সব ধর্মই সত্য"—এই বাণীই ভারতীয় সন্ন্যাসীদ্বয় পাশ্চাত্য দেশে জানিয়েছেন। এই যে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এটি চারিত্রিক সহিষ্ণুতা ও হার্দিক উদারতাজাত। এই কারণেই হয়তো টাইমস্ পত্রিকায় বেরিয়েছিল যে ভাল খৃষ্টান বলতে ভারতের স্বামীদেরই যেন বোঝায়। তাঁরাই যীশুর শিক্ষা পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন। নিউইয়র্ক টাইমসে মন্তব্য করা হয়েছিল—"ঈশামসির উপদেশবাণী তাঁরা স্বীয় জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা জ্ঞানের আলোক ছাড়া আর কিছু দান করেন না। তাঁরা আমাদের ধর্মকে ও সমাজকে অতি শ্রদ্ধার সংগেই দেখে থাকেন।"

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সন্ন্যাসীদ্বয়ের উপরিউক্ত বৈশিষ্টাগুলির দ্বারাই হয়তো টলস্টয় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। টলস্টয় ছিলেন খাঁটি অর্থে খ্রীষ্টান। যীশুর প্রেমের মন্ত্রকে (Resist not evil) নিজের জীবন চর্চায় মূর্ত করে তুলেছিলেন। প্রতিরোধের বিপক্ষে ছিলেন তিনি। যুদ্ধের হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, কর আদায়ের হিংস্র পদ্ধতির বিরুদ্ধে, বিচারালয়ের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে—অপরদিকে টলস্টয় প্রেমের পক্ষে, অহিংসার পক্ষে, অপ্রতিরোধ নীতির পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে, সর্বোপরি মানবিকতার পক্ষে।

এই কারণেই হয়তো তাঁর প্রচারিত ফলিত বেদান্ত (Practical Vedanta) যা মানব সভ্যতাকে প্রেম ও শান্তির ললিত বাণী শোনাতে সক্ষম হয়েছিল সেই বিষয়ে টলস্টয় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন ও অভেদানন্দের গ্রন্থ সংগ্রহ করে পড়েছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ রচিত বেশ কিছু গ্রন্থ জার্মানীতে প্রকাশিত হয়েছিল। N. O Einhorn ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াসনায়া পলিয়ানাতে কয়েকটি পুস্তক পাঠান টলস্টয়ের পাঠের জন্য। বইগুলি—

(1) The Religion of the Indians,

(2) Why does the Indian reject the new church, although he recognises Christ ?

(3) The Word and the Cross in Old India.

(4) Why the Indians are Vegetarians.

(5) Divine Community.

(6) The Path to Beautitude.

(7) The Philosophy of Good and Evil.

(8) Who is the Savoir of the Soul ?

(9) Does the Soul exist after Death ?

বইগুলি টলস্টয় যে মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন তার প্রমাণ আছে, নিজের হাতে নোট-করা আছে কোথাও কোথাও। The Path to Beautitude গ্রন্থের মলাটের পাতায় 'Excellent' বলে টলস্টয় লিখে রেখেছেন। যীশুর বাণী, প্রেম ও অহিংসার মধ্যে উভয়েই স্বর্গসুখের পথটি অনুসন্ধান করেছিলেন।

এরপর টলস্টয়ের হাতে আসে অভেদানন্দের বেদান্তগ্রন্থ The Philosophy of the Vedanta, the Divine Truth of Man (১৯০৩ খ্রীঃ নিউইয়র্কে মুদ্রিত হয়েছে)।

এই বইটি পড়ে টলস্টয় উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করেন—"হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কিছু বই গতকাল পড়ছিলাম। জীবন সম্পর্কে আত্মা সম্পর্কে অপূর্ব গ্রন্থ। অহংকে নয়, তোমার ভেতরে যে আত্মা আছে তাকে ভালবাস—এই অসীম সত্তাকে ভালবেসে তুমি জাগতিক বস্তুকে ভালবাসবে—সেই আত্মোপলব্ধি হলে তুমি দিব্য আনন্দ উপলব্ধি করবে। আমি ক্রমশ এই সত্যটিকে বুদ্ধি দিয়ে নয় অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছি বলে খুব ভাল লাগছে।"

টলস্টয় স্বামী বিবেকানন্দের লেখায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। রোঁমারোঁলা একদা দিলীপকুমার রায়কে একথা জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রুশদেশে বিবেকানন্দের প্রভাবের কথাও জানিয়েছেন তিনি। "তাঁর পরম বন্ধু পল বীরুকফ্ ও আরও অনেক সাহিত্যিক এখনও বিবেকানন্দের নাম জপ করেন। বিশেষ করে রুশ দেশে এমন আরও অনেক লোক আছেন।" স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের রচনার গবাক্ষ পথ দিয়ে টলস্টয়ের চিত্ত ভারতাত্মার সংগে যুক্ত হল। টলস্টয় স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর একখানা সংকলন গ্রন্থ বার করবার আয়োজন করেছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মাসে প্রাচ্যবিদ্ এন, এইনগর্ণকে লেখা একটি চিঠিতে এই ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। "বিবেকানন্দ আমার কাছে একজন বরেণ্য ব্যক্তি। আমরা তাঁর রচমাবলীর একখানা সংকলন গ্রন্থ বার করবার আয়োজন করেছি।" (গ্রন্থ জগৎ, ডিসেম্বর ১৯৬০)

প্রসংগতঃ উল্লেখ করা চলে সোভিয়েত রাশিয়ায় বিবেকানন্দের একাধিক গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। তার মধ্যে আছে ভক্তিযোগ, হিন্দুধর্ম, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, মোই উচিটেল, (My master) ফিলসাফয়া বেদান্তি, ফিলসফিয়া যোগ (রাজযোগ) এবং সিয়েস্ত নাস্তাভলিনিয়ে (Shest Nestavlenyi) ইত্যাদি গ্রন্থ।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে টলস্টয় 'পোসরেদ্‌নিক' সংস্করণের যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে- 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উক্তি' বইটি অন্তর্ভুক্ত করেন এবং এই সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দের রচিত কিছু ধর্ম পুস্তিকাও ঐ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রকাশকের কাছে পাঠান। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে শেষ পর্যন্ত টলস্টয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি বলে আলেকজাণ্ডার সিফম্যান জানান।

এই মনীষীত্রয়ের জীবনের আদর্শ ও অনুধ্যানকে একই সূত্রে বিন্যাস করা চলে। গীতোক্ত শ্লোকটি তাঁদের উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করা হল

"অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥"

যিনি কাওকেও ঘৃণা করেন না, যিনি সকলের মিত্র, যিনি সকলের প্রতি করুণাসম্পন্ন, যাঁর নিজস্ব বলতে কিছু নেই, যিনি সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, ধৈর্যশীল, যিনি অহংকার মুক্ত হয়েছেন, যিনি সদাই সন্তুষ্ট, যিনি সর্বদাই যোগমুক্ত হয়ে কর্ম করেন তিনিই শ্রেষ্ঠজন।

তৃতীয় অধ্যায়

এক তরুণ প্রবাসী বিপ্লবী ও লিও টলস্টয়

বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে তারকনাথ দাস অন্যতম ব্যক্তিত্ব। বিদেশের পটভূমিতে থেকে স্বদেশভূমির মুক্তি আন্দোলনে আপ্রাণ সাহায্য ও সহযোগিতা জুগিয়েছেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, বহু গ্রন্থের লেখক আর স্বামী বিবেকানন্দের পরম ভক্ত—এই তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। জন্মেছিলেন ১৮৮৪ খৃঃ মাঝিপাড়ায় (২৪ পরগণা জেলা)। মধ্যবিত্তঘরের ছেলে পিতা কালীমোহন দাস কলকাতার কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফে, সাধারণ কেরানীর কাজ করতেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সতীশচন্দ্র বসু তারকনাথ দাসকে অনুশীলন দলে টেনে আনেন। লেখাপড়ায় মেধাবী ছাত্র হলেও অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কলেজের পড়া ছেড়ে দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস ওঅরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে তখন বঙ্গব্যাপী আন্দোলন। তিনি এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খৃঃ—এই সময়টি ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক পরম গুরুত্বপূর্ণ সময়। বিভিন্ন স্থানে দুই হাজারের বেশী জনসভা হয়েছিল (ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সমীক্ষা অনুযায়ী)। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলি ও সংবাদপত্রগুলি সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বরিশালে লর্ড কার্জনের কুশপুত্তলিকা দগ্ধ করা ও বৃটিশপণ্য বর্জনের নীতিতে ছাত্রদের পিকেটিং—ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইংরেজ সরকার ব্যাপক লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তারীর অধিকার দিলেন পুলিশকে। স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশ গেল যেসব ছেলে স্বদেশী করবে তাদের যেন কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সময়ে ১৯০৩ খৃঃ তারকনাথ দাস টাঙ্গাইল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন—কিন্তু তিনি কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ভারতের ঐ অগ্নিবর্ষী

মহালগ্নে তাঁকে পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে থাকতে হোল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশত্যাগী করেন ইংরেজ শাসক। তিনি ছদ্মবেশে—সাধুর সজ্জায় ১৯০৫ খৃঃ তারক ব্রহ্মচারী ছদ্মনাম নিয়ে জাপানে পালিয়ে গেলেন। কেউ তাঁকে সন্দেহ করতে পারেনি, কারণ তিনি ইতিপূর্বেই স্বামীজী ও সিস্টার নিবেদিতার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। একবছর বাদে তিনি সমুদ্রপথে জাপান থেকে গেলেন সানফানসিস-কোতে। সেখানে তিনি জীবিকার জন্য বেছে নিলেন স্বাধীন সাংবাদি-কতার বৃত্তি। "ফ্রি হিন্দুস্থান" নামে একটি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন (১৯০৭ খৃঃ—১৯১০ খৃঃ), এই পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে ভারতীয় জনসাধারণের সমস্যার কথা আলোচনা করতেন ও মননশীল প্রবন্ধাবলীর সাহায্যে ভারতীয়দের সপক্ষে তিনি জনমত গঠন করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এই বিখ্যাত পত্রিকায় ভারতীয় জীবনে ব্রিটিশ শাসকের পীড়ন ও অত্যাচারজনিত নানা সমস্যার উল্লেখ করে তিনি টলস্টয়কে একটি চিঠি দেন—তারই উত্তরে টলস্টয় লিখেছিলেন 'এ লেটার টু এ হিন্দু।'—এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের বাইরে বিভিন্ন স্থান থেকে লণ্ডন, জার্মান, আমেরিকা ভারতের প্রবাসী বিপ্লবী কখনও এককভাবে কখনও যৌথভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সেইদিক থেকে বিচার করলে আমেরিকায় বিপ্লবী তারকনাথের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯০৭ খৃঃ আমেরিকার কালিফোর্ণিযায় তারকনাথ দাস 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' তৈরী করেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন পাণ্ডুরং খামখোজে, খগেন্দ্রনাথ দাস ও অধরচন্দ্র লস্কর। সদস্য সংখ্যা ছিল চারশত। এই প্রতিষ্ঠানের দুটি শাখা ছিল। অনেক প্রবাসী শিখ এর সদস্য ছিলেন। তাঁরা আমেরিকা থেকে বিপ্লবী পুস্তিকা ও প্রচারপত্র স্বদেশে পাঠাতেন। এরপর তারকনাথ দাস ১৯১৩ খৃঃ লালা হরদয়ালকে 'গদরপার্টি' গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। 'গদরপার্টির' অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন তিনি।*

---

*আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের বিচ্ছিন্ন সংস্থাগুলি

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন সেন ও ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন কর আমেরিকায় যান—তাঁরা দুজনেই তারকনাথদাসের সাহায্য পান। জার্মানী ও আমেরিকায় সশস্ত্র বিপ্লবীদের মধ্যে তারকনাথ দাস সক্রিয়

একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে 'গদরপার্টি' তৈরী করে। গদর শব্দটির অর্থ বিপ্লব। লালা হরদয়াল এই নামটি পছন্দ করেছিলেন। সোহনসিং এই পার্টির প্রেসিডেন্ট ও হরদয়াল ছিলেন সেক্রেটারী। পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস হয় ৪৩৬ নং হিল স্ট্রীটে ও বাড়ীটির নাম দেওয়া হয় 'যুগান্তর আশ্রম'—কোষাধ্যক্ষ হন মুনশীরাম—সাপ্তাহিক 'গদর' পত্রিকা ও অন্যান্য পুস্তিকা প্রকাশ করা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার আয়োজন করে আমেরিকার জনমতকে ভারতের স্বাধীনতার অনুকূলে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। গদর পার্টির কর্মসূচীটি উল্লেখযোগ্য।

১। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত ভারতীয়দের স্বাধীনতার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা—

২। প্রভাবশালী এবং ব্রিটিশ অনুগত কর্মচারীদের হত্যা করা—

৩ বৈপ্লবিক পতাকা উত্তোলন করা—

৪। জেলভাঙা—

৫। ট্রেজারী ও থানা লুণ্ঠন করা—

৬। রাজদ্রোহমূলক সাহিত্যের প্রচার করা—

৭। বৃটিশের শত্রুজাতিসমূহের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করা—

৮। রাজনৈতিক ডাকাতি করা।

৯। অস্ত্র সংগ্রহ করা, বোমা তৈরী করা—

১০। গুপ্ত সমিতিসমূহ গঠন করা—

১১। রেলপথ ও টেলিগ্রাফের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা—

১২। বৈপ্লবিক কাজকর্মের জন্য যুবক সংগ্রহ করা—এককথায় বলা চলে চরমপন্থী একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচী। (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)।

অংশ নিয়েছিলেন। বার্লিনের "ডয়চের ফেরাইন ডেয়ার ফ্রয়েণ্ডে ইণ্ডেন"—(অর্থাৎ বন্ধুভাবাপন্ন ভারতের জার্মান সমিতি) এই সমিতির সঙ্গে গদর পার্টি একযোগে কাজ করতে এগিয়ে আসে। এই উদ্দেশ্যেই তারকনাথ দাস, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বার্লিনে আসেন। জাহাজযোগে ভারতের উপকূলে অস্ত্রশস্ত্র পাঠান এঁদের প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু তারকনাথ দাস ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইউরোপ থেকে আমেরিকায় ফিরে এলেন তখন 'জার্মান-হিন্দু ষড়যন্ত্রের' মামলায় জড়িয়ে পড়লেন। ব্রিটিশ সৈন্যদের মারবার জন্য আমেরিকা থেকে তিনি অস্ত্র পাঠাচ্ছিলেন—এই অভিযোগে তাঁর সশ্রম কারাদণ্ড হলো বাইশ মাসের জন্য। এই বিচারে তিনি হয়তো তাঁর আমেরিকার নাগরিকতা হারাতেন—কিন্তু Friends of Freedom of India society র পরিচালক শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের সাহায্যে তাঁর নাগরিকত্ব রক্ষা পেল।

তারকনাথ দাসের জীবনের এর পরের ইতিহাসটুকু ভিন্ন খাতে বয়ে গেছে। বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে ফিরে এলেন। বাল্যের সেই মেধাবী ছাত্র—প্রথম জীবনে প্রথম শ্রেণীতে এণ্ট্রান্স পাশ করা তারকনাথ দাস নিজের অধ্যবসায়ে ১৯১৪ খ্রীঃ পি.এইচ. ডি লাভ করেন জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক আইন।" তিনি যে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর ও ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হয়েছিলেন তা আগেই জানিয়েছি। জার্মানীতে ভারতীয়দের পড়াশুনার জন্য Indian Institute of Munich (১৯৫২ খ্রীঃ) ও আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রদের জন্য Taraknath Das foundation in Colombia স্থাপন করেন। বিপ্লবের কাজে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য তিনি ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছেন ও বহু বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতার বিষয়গুলি উল্লেখ করা হোল।

(1) The awakening of Asia or Asia in World Politics
(2) India's position in International Politics
(3) The Swaraj (nationalist) Movoment of India
(4) American Trade Opportunities in India
(5) The Labour movement in Asia
(6) Japan in world politics
(7) China in world politics
(8) Philosophy and Literature of Ancient and Modern India
(9) Buddhism
(10) Confucianism
(11) America's Responsibility of world peace
(12) Mahatma Gandhi and world peace

তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন নিষ্ঠাভরে। তারকনাথ দাসের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী—

(1) Is Japan a Menace to Asia ?
(2) Anglo-Japanese Alliance and America
(3) India's position in world politics (1922, Calcutta, Saraswaty Library.)
(4) Isolation of Japan in world politics
(5) Rabindra Nath Tagore, his religious, social and and political ideals. (1932, Cal. Saraswaty Library)

তাঁর জীবনের ঘটনাপঞ্জী থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'ল যে তারকনাথ দাস শুধু বিপ্লবী বীর নন—তিনি সুপণ্ডিত, বিদগ্ধ মনন নিয়ে এশিয়া ও ইউরোপের নানা সমস্যায় কালাতিপাত করেছেন। বিশেষতঃ চীন, জাপান ও ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো তাঁর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এশীয় রাষ্ট্র-চিন্তার প্রবক্তা ও সুলেখক হিসেবে আমেরিকায় তিনি সেই যুগে প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন। ভারতের এই মনীষী ভিন্ন মহাদেশবাসী

হয়েও* দেশবাসীর জন্য আন্তরিক প্রেম অনুভব করেছেন—ব্রিটিশ শাসকদের উৎপীড়ন ও শোষণ ভারতের দুর্গতির মূল কারণ। ভারতকে পরাধীনতার শৃংখলমুক্ত করতে হবে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধিক্কারে তাঁর প্রবন্ধাবলী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সুদূর আমেরিকা থেকেই তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন ভারতকে শোষণ মুক্ত করার জন্য। জীবনের প্রথমপর্বে চরমপন্থী বিপ্লবী তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে আর দ্বিতীয়পর্বে শাণিত মননের প্রচণ্ডতায় তিনি ভারতে ব্রিটিশ অত্যাচার ও শোষণের মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। এই উদ্দেশ্যেই 'ফ্রি হিন্দুস্থান' পত্রিকায় সম্পাদনা করতেন—১৯০৭ খ্রীঃ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভটি ভারত মুক্তির আন্দোলনের অন্যতম অংগ ছিল। এই পত্রিকার প্রথম পাতায় যে শ্লোগানটি উদ্ধৃত হত সেটা থেকে পত্রিকার উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। যেমন—'ফ্রি হিন্দুস্থান' পত্রিকাটি হচ্ছে স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার সাধনের একটি মাধ্যম। "Free Hindusthan is our organ of freedom and of political, social and religious reforms."

"Resistance against tyranny is obedience to God." 'ফ্রি হিন্দুস্থান' পত্রিকার নীতিবাণীটি ১৯০৯-এর সংখ্যাগুলিতে একটু ভিন্নভাবে লেখা হত। 'Obedience to God'—কথাটি পরিবর্তন করে লেখা হ'ল "Service to mankind and necessity for civilisation."

হার্বার্ট স্পেন্সারের A study of Sociology ও Fundamental of Ethics গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি থাকত—"Resistance to violence

---

* ১৯১৪—আমেরিকার নাগরিকত্ব পান।

১৯২৪—আমেরিকার মেয়ে (বিধবা) Mary Keatingকে বিয়ে করলেন।

সমগ্র কর্মজীবন—আমেরিকায়

১৯৫৮—২২শে ডিসেম্বর আমেরিকায় মারা যান।

is not only justified but it is compulsory. Non-resistance is contradictory to altruism as well as to egoism." (H. Spencer. A study of Sociology' কিংবা "Everyman is free to do what he wants on the condition that he does not infringe upon an equal freedom of any otherman."

(H. Spencer, Fundamentals of Ethics)

প্রসংগত বলা চলে ১৯৫০ খ্রীঃ ২৬শে জানুয়ারী যখন ভারতে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল, নিউইয়র্কের এক ভারতীয়দল তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন এই কারণে যে তিনি ফ্রি হিন্দুস্থান পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার জন্য অক্লান্ত লেখনী ধারণ করেছিলেন—'ফ্রি হিন্দুস্থান' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে টলস্টয়ের সঙ্গে তারকনাথ দাসের পত্র বিনিময় হয়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে টলস্টয়ের "আমি নীরব থাকতে পারি না" (I Cannot Remain Silent) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে রুশ জারতন্ত্রের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি যে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন অনেক ভারতীয় তার মধ্যে যথেষ্ট সাহসের প্রকাশ দেখে-ছিলেন। তাঁরা কেউ কেউ টলস্টয়কে ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের উৎপীড়ন ও অত্যাচারের মুখোশ খুলে দেবার জন্য কলম ধরতে অনুরোধ করেছিলেন। টলস্টয়ও এক খোলা চিঠিতে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আলোচনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ঠিক এমনই সময়ে তিনি তারকনাথ দাসের কাছ থেকে একটি পত্র পান। আমেরিকা থেকে প্রেরিত তারকনাথ দাসের এই পত্রটিই নবীন ভারতের প্রতি টলস্টয়ের বার্তা পাঠাবার তাগিদটি ত্বরান্বিত করে তুলল।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে সিয়াটেল থেকে তারকনাথ দাস

টলস্টয়কে একটি পত্র দেন। চিঠিতে তিনি জানালেন—টলস্টয় নিপীড়িত রুশ জাতির জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করেছেন এবং রুশ সাধারণ মানুষের প্রতি সমগ্র বিশ্বের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়েছেন। তাঁর নাম মানবতার বর্ম স্বরূপ। তিনি তাঁর দেশবাসীকে সচেতন করাতে সক্ষম হয়েছেন। সরকারও উৎপীড়ন ও অত্যাচার থেকে কিছুটা বিরত হয়েছেন। রুশ দেশবাসীরা কিন্তু পৃথিবীতে সব থেকে অত্যাচারিত নয়। সেই তুলনায় ভারতবাসীরা আরও বেশী বৃটিশ শাসকের দ্বারা লাঞ্ছিত ও পীড়িত হচ্ছে। স্যার উইলিয়ম ডিগবির গ্রন্থ Prosperous British Indiaতে দেখান হয়েছে ১৮৯১ থেকে ১৯০০ খ্রীঃ পর্যন্ত দশ বছরে ভারতে দুর্ভিক্ষজনিত ১৯ মিলিয়ন লোক অনাহারে মারা গেছে, যেখানে ১০৭ বছরের যুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী মাত্র ৫ মিলিয়ন লোক মারা গেছে। টলস্টয় যুদ্ধকে ঘৃণা করেন। কিন্তু একবার কি তিনি ভেবেছেন ভারতে অনাহারের যন্ত্রণা কি ভয়ঙ্কর। এই দুর্ভিক্ষ কিন্তু খাদ্যের অভাবে নয়। বরং ব্রিটিশ সরকার আমাদের দেশকে লুঠ করছে ও সাধারণের কাছ থেকে জোর করে হরণ করছে বলে। এটা খুবই লজ্জার বিষয় যখন দেখি আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে রয়েছে অথচ ইংরাজরা হাজার হাজার টন চাল ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু বিদেশে রপ্তানী করছে।

ভারত জনসংখ্যার ভারে পীড়িত। ভারতে ব্রিটিশ নীতি সমগ্র খ্রীষ্ট সভ্যতার ভয়াবহ বিপদটির ছবি তুলে ধরে। এই চিঠিটিতে তারকনাথ দাস ভারতের দুর্দশার ছবিটি তুলে ধরেন। ভারতের এই দুর্দিনে সমগ্র বিশ্বে শুধু একজন মহাত্মা টলস্টয়, যিনি দেবতুল্য মহামানব তাঁকেই তিনি স্মরণ করলেন। কাতর প্রার্থনা জানালেন। একমাত্র টলস্টয়ের লেখনীই পারবে সমগ্র বিশ্বের জনমত তৈরী করতে, ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পাশবিকতার বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন করতে। পারবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আসনগুলি কাঁপিয়ে তুলতে। সকাতরে তারকনাথ দাস লিখলেন—"আপনার

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে সব রচনা প্রকাশিত—তার দ্বারা আপনি রুশদেশের যথার্থ মহৎ মঙ্গলসাধন করেছেন। তাই আপনাকে সনির্বন্ধ মিনতি আপনি সময় করে ভারতের দুঃখজনক অবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত জানিয়ে একটি নিবন্ধ যদি রচনা করেন। ক্ষুধায় মৃতকল্প বহু লক্ষ ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আপনার খৃষ্ট সত্তার প্রতি আমার প্রার্থনা, আপনি আমাদের হয়ে কিছু বলুন।"*

এই চিঠির উত্তরেই টলস্টয় এক সুদীর্ঘ বার্তা প্রেরণ করলেন, সেটিই তাঁর বিখ্যাত রচনা 'এ লেটার টু এ হিন্দু' নামে বিখ্যাত।** তারকনাথ দাসের পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টলস্টয় লিখতে বসলেও কিছু তথ্য ও বিবরণের অভাবে তাঁকে কিছুকাল লেখা বন্ধ করে

---

* এই চিঠিটির উল্লেখ Shiffman-এর Tolstoy and India গ্রন্থে পেয়েছি। Shiffman এই চিঠিটি সম্পর্কে সে সংবাদটি দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করা হল। "তারকনাথদাসের লেখা টলস্টয়কে পত্রটি বহুকাল ধরে হারিয়ে গেছে বলে ধারণা ছিল। পি, আই বিরুকফ এই চিঠিটির সন্ধান পাননি। এটি বর্তমানে টলস্টয়ের স্মৃতি সংরক্ষণশালায় খুঁজে পাওয়া গেছে। এটি ১৯৫৭ খৃঃ সোভিয়েত দেশের একটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

** সিফম্যান তাঁর 'ইণ্ডিয়া ও টলস্টয়' গ্রন্থে জানিয়েছেন—এই রচনাটির পেছনে টলস্টয়ের কত সহানুভূতি, কত ঐকান্তিক পরিশ্রম ছিল তারকনাথ দাসের চিঠিটি পেয়ে টলস্টয় ১৯০৮ খ্রীঃ ৭ই জুন পত্রোত্তর লিখতে বসেন। কিন্তু প্রায় ছয় মাস লেগেছিল চিঠিটি শেষ করতে। টলস্টয়ের সংরক্ষণ শালায় চিঠিটির পাণ্ডুলিপির ৪১৩ পাতা জুড়ে প্রমাণ আছে যে এটি লিখতে তাঁকে কতটা মানসিক যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর মূল্যবান সময়ের অনেকাংশই চিঠিটি লিখবার জন্য ব্যয় করতে হয়েছিল—কিন্তু তবুও তাঁর মনে একটা দ্বিধা থেকে যাচ্ছিল—তিনি যে উপদেশ ও বাণী ভারতীয়দের জন্য পাঠাচ্ছেন, সেটি তাদের উপযোগী হবে কিনা। তিন দিনই তিনি এই রচনাটির একটি খসড়া করলেন—কিন্তু টলস্টয়কে থামতে হলো, তাঁর মনে হলো অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিবরণ তাঁর অজানা। তাই তার নির্দেশে ভি, পি,

রাখতে হয়েছিল। পরে তারকনাথ দাসের কাছ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে পত্রোত্তরে এক বিশ্ববিখ্যাত রচনার জন্ম হল। এই চিঠিতে টলস্টয় জানালেন তাঁর অন্তর ভারতবাসীর দুঃখে ও নির্যাতনে কাতর। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরাট এক জাতিকে শোষণ করছে, পীড়ন করছে, দমন করছে। সেই ভয়াবহ ভাবনায় তাঁর চিন্তাজগৎ জর্জরিত। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাছে ভারতের অধিবাসী তাদের পরিশ্রমের ফসল তুলে দিচ্ছে, শুধু তাই নয়—তাদের জীবনটাও বিকিয়ে দিয়েছে। নিজের দেশের কাছে ভারত উৎপীড়িত নয়—বিদেশী শাসক তাদের দাসত্বে আবদ্ধ করে রেখেছে। অথচ এই শাসকগোষ্ঠী অপেক্ষা ভারতীয়রা অনেকাংশেই দৈহিক ও মানসিকতার দিক থেকে অনেকবেশী উন্নত। চিঠিটির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এই প্রবন্ধের শেষে যুক্ত হল।

মাকোভিৎস্কি তারকনাথ দাসের কাছে বিবরণাদি জানতে চাইলেন। আগস্ট মাসে তিনি রচনাটি নতুনতর রূপ দেবার জন্য নতুন করে লিখতে বসলেন কিন্তু সন্তুষ্ট হতে না পেরে লেখা বন্ধ করে রাখলেন। ঐ বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে কানাডা থেকে একটি পত্র পান টলস্টয়। পত্র প্রেরকের নাম জি, ডি, কুমার একজন শিক্ষক, ভারতেরই একজন বুদ্ধিজীবী। তিনি ভারতের তখনকার অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে চিঠি দেন ও টলস্টয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই ভারতীয় শিক্ষকের চিঠি থেকে টলস্টয় বেশ কিছু উপকরণ পেলেন। ইতিমধ্যে তারকনাথ দাস ভারতের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করে কিছু পুস্তিকা ও একটি ছবি পাঠালেন। অবশ্য এর আগে প্রথম চিঠিটি ফ্রি হিন্দুস্তানের দুটি সংখ্যা পাঠিয়েছিলেন। ইয়াসনায়া পলিয়ানার গ্রন্থাগারে তারকনাথ দাসের প্রেরিত ঐ পুস্তিকা ও বিবরণ সংরক্ষিত আছে। "The Skeleton at the Jubilee feast being a series of suggestions towards the presentation of famine in India"—নামে W. Wedderburn-এর একটি পুস্তিকা ও সেই সংগে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতীয়দের একটি ছবি তিনি পাঠিয়েছিলেন। মলাটের পাতায় লেখা ছিল—"লক্ষ লক্ষ দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতবাসীর পক্ষ থেকে তারকনাথ দাসের আন্তরিক শুভেচ্ছা সহ টলস্টয়কে প্রেরণ করা হল।"

'এ লেটার টু এ হিন্দু' এই রচনাটি যে তারকনাথ দাসের চিঠির উত্তরে লিখিত হয়েছিল—এই সংবাদটি বিরুকফের জানা ছিল না। কালিদাস নাগের ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'টলস্টয় ও গান্ধী' গ্রন্থে জানান হয়েছিল যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের দ্বারা পরিচালিত ইউরোপে যে বিপ্লবী যুবকেরা কাজ করছে তাদের চিঠির উত্তরে টলস্টয় 'এ লেটার টু এ হিন্দু' রচনা লিখেছেন। পরবর্তী সময়ে কাউণ্ট লিও টলস্টয় ও তারকনাথ দাসের পত্রাবলী "Twentieth Century Magazine." (১৯০৯ খ্রীঃ থেকে ১৯১০ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের দেশেও সরস্বতী লাইব্রেরী, (সি ১৮, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।) 'টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরী ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত উভয়ের পত্রাবলী প্রকাশ করে জনসাধারণের পরম উপকার সাধন করেন।

'এ লেটার টু এ হিন্দু'—সমগ্র এশিয়াবাসীর মনে প্রবল আলোড়ন এনেছিল। এটি টলস্টয় রুশ ভাষায় লিখেছিলেন। গান্ধীজী এটির ইংরেজী ও গুজরাটী অনুবাদ করেছিলেন। এই চিঠির ভাষান্তরের ব্যাপারটিও ঐতিহাসিক মূল্য পেতে পারে। গান্ধীজী তখন আফ্রিকার জোহান্সবার্গে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর এক বন্ধু তাঁকে টাইপ করা রচনাটি পাঠান। গান্ধীজী টলস্টয়ের অনুগত ভক্ত ; তাই তিনি টলস্টয়ের এই নিবন্ধটির প্রতি খুব উৎসাহী হয়ে উঠেন ও টলস্টয়ের কাছে এই রচনাটির ভাষান্তর করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। গান্ধীজী টলস্টয়কে আরও জানিয়েছিলেন যে তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করতে চান। গান্ধীজী ইংরেজী ও গুজরাটী ভাষায় নিবন্ধটির অনুবাদ করেছিলেন। পরে হিন্দী ভাষায় অনূদিত হয়েছে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ আজ পর্যন্ত হয়নি। বাঙ্গালা ভাষান্তরটি এই গ্রন্থে এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। গান্ধীজী ঐ রচনার ইংরেজী সংস্করণটিতে একটা ছোট ভূমিকা দিয়েছেন। তার সম্পূর্ণ অনুবাদ 'গান্ধীজী ও টলস্টয়' অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

অহিংসার পূজারী গান্ধীজী স্বভাবতঃই টলস্টয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত

হয়েছিলেন ও তাঁকে ট্রান্সভ্যালের দুঃখ দুর্দশার কথা জানাবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে তারকনাথ দাস—যিনি একজন বিপ্লবী, যাকে ইংরেজ শাসক দেশ ছাড়া করেছিল—যিনি বিদেশে থেকে ভারতীয়দের অস্ত্রশস্ত্র জোগাতেন—অর্থাৎ যার মন্ত্র হিংসা, যিনি ইংরেজ পীড়কদের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধের পক্ষে, (প্রসংগতঃ স্মরণ করা যায় ফ্রি হিন্দুস্থানের মলাটে যে বাণী উদ্ধৃত থাকত সেগুলি সম্পূর্ণভাবেই জানিয়ে দেয় তারকনাথ দাস মতে ও পথে টলস্টয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির মানব) তাঁর মত বিপ্লবী ও ভারতবাসীর দুর্দিনে সমগ্র বিশ্বে একজনকেই বিশ্বাস করেছিলেন—যিনি ভারতের মুক্তির পথ দেখাতে পারবেন তিনি টলস্টয়। যার পথ ও মত অহিংসা ও প্রেমের মাধুর্যে আবৃত। টলস্টয় অকুণ্ঠচিত্তে নবীন ভারতের জন্য অমৃত বার্তা পাঠালেন অন্যায়কে প্রতিরোধ করনা, তাই বলে অন্যায়কে প্রশ্রয়ও দিও না—বিচারালয়ের সহিংস আইন, কর আদায়ের সহিংস পথ ও যোদ্ধার হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাক—কেউ তোমাকে দাসত্বে আবদ্ধ করতে পারবে না। তিনি বৈজ্ঞানিক উন্নতি তথা শিল্পোন্নতির বিরোধী। ঘৃণ্য শিল্পোন্নতি মানুষের শুভবুদ্ধিকে তিলে তিলে দগ্ধ করছে—তিনি জাপানকে নিন্দা করেছেন এই কারণে। ভারতীয়দেরও শিল্পোন্নতি থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। গান্ধীজী এই পত্রটির ভূমিকায় লিখেছেন—"টলস্টয় যা বলেছেন তার পুরোটা আমরা গ্রহণ নাও করতে পারি—কোন কোন বিষয় আবার ঠিকমত বর্ণনা করা হয়নি।" প্রকৃতপক্ষে যে সত্য দেশের উপর অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে কাজ করে তাকেই গ্রহণ করতে বলেছেন তিনি। সুতরাং বলা চলে তারকনাথ দাস ও টলস্টয় দুই বিপরীত জগতের অধিবাসী হয়েও একটি উদ্দেশ্যে উভয় মনীষীর মিলন হয়েছিল। সেটি হচ্ছে এই ভারতীয় বিপ্লবী তারকনাথ দাসের দেশপ্রেম আর রুশ দেশের ঋষি টলস্টয়ের ভারতপ্রীতি। ভারতের প্রতি অনুরাগ টলস্টয়ের বরাবর। কাজেই যে ভারতপ্রেমের তাগিদে তারকনাথ দাস

টলস্টয়ের আদেশ, উপদেশ ও সাহায্য প্রার্থনা করে ছিলেন—ঠিক সেই একই প্রেমের আবেগে টলস্টয় 'এ লেটার টু এ হিন্দু' লেখার প্রেরণা পান।

এই রচনাটি গান্ধীজী ট্রান্সভ্যাল থেকে ১৯০৯ খ্রীঃ অকটোবর মাসে প্রকাশ করেন। এর প্রত্যুত্তরে তারকনাথ দাস 'কাউন্ট টলস্টয়ের কাছে নবীন ভারতের খোলা চিঠি' লিখলেন। এই পত্রে তিনি টলস্টয়ের অহিংসা ও অপ্রতিরোধ নীতির সমালোচনা করেছেন। এই রচনাটিতে নানা প্রমাণ দাখিল করে তিনি বলেছেন আবেদন নিবেদন কিংবা অপ্রতিরোধ কোন দিনও জয়ী হবে না। অন্যদিকে নিরস্ত্র জনসাধারণ দুর্বল হয়ে পড়ে। অপ্রতিরোধ কখনও দুর্নীতি দূর করতে পারে না। বরং প্রতিপক্ষকে দুর্বল মনে করে এর পাশবিক শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। অহিংসাকে দুর্বলের অজুহাত মনে করে উৎপীড়কের দল দুর্বল ও নিরস্ত্র জনসাধারণকে সহজেই পরাজিত করে। এইভাবে তারকনাথ দাস টলস্টয়ের সঙ্গে ভাবগত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হন তারকনাথ দাস এক সুদীর্ঘ চিঠি দেন। সেটি তিনটি পর্যায়ে সরস্বতী প্রেস প্রকাশ করে।

পত্রটির শেষাংশে তারকনাথ দাস টলস্টয়কে দুটি আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন—একটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের অবলুপ্তি ঘটাতে হবে। আর ভারতীয় জনসাধারণকে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দিতে হবে—সমস্ত শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য ভারতের জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে হবে। ঐ পত্রে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাতে সহজেই তাঁকে র‍্যাডিকাল বামপন্থী রূপে চিনতে অসুবিধা হয় না। তারকনাথ দাসের দ্বিতীয় পত্রগুচ্ছ—যার মধ্যে শুধু সশস্ত্র বিপ্লবের কথাই নয়, মানবিকতায় যা পরিপূর্ণ, যার মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা—ভাবীদিনে সাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজের পরিকল্পনা রয়েছে ; সেইগুলি টলস্টয়ের হাতে খুব সম্ভবতঃ পৌঁছয় নি। সিফম্যানের 'টলস্টয় ও ভারত' গ্রন্থে এই তথ্যের স্বীকৃতি আছে।

তাছাড়া টলস্টয়ের ঐ সময়কার ডায়েরি, নোট বই কিংবা রেজিস্টার্ড চিঠির হিসেব খাতায়—কোথাও তারকনাথ দাসের দ্বিতীয় পত্রগুচ্ছ পৌঁছেছে বলে লেখা নেই। যদিও পরবর্তীকালের রুশ বিপ্লবীরা এই পত্রগুচ্ছের সংগে পরিচিত ছিলেন খুবই। (মস্কোর Institute of Marxism-Leninism তে একটা কপি আছে)

ভারতেও তারকনাথ দাসের দ্বিতায় পত্রগুচ্ছ খুব বেশী পরিচিত নয়। কিছু সংখ্যক বামপন্থী মননশীল নেতাদের মধ্যে এটি জনপ্রিয়। বিশিষ্ট ভারতীয় চিন্তাবিদের—শ্রী চিন্মোহন সেহানবীশের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে একটি কপি আছে। আগেই বলেছি—আমেরিকার 'টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরি ম্যাগাজিনে' এই পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রগুচ্ছের প্রথমভাগ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ভ্যলুম ২, নং ৮, দ্বিতীয় ভাগ জুন, ১৯১০, ভলুাম ২, নং ৯, তৃতীয় ভাগ আগস্ট ১৯১০, ভলুাম ২, নং ১১, চতুর্থ ভাগ সেপ্টেম্বর ১৯১০, ভ্যলুম ২, নং ১২ ট্যুয়েন্টিথ সেঞ্চুরী ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫২ খ্রীঃ তারকনাথ দাস ওয়াটুমূল ফাউণ্ডেশনের ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে এদেশে আসেন। হয়তো সেই সময়েই সরস্বতী লাইব্রেরী টলস্টয়ের 'এ লেটার টু এ হিন্দু'র সঙ্গে এই পত্রগুচ্ছ প্রকাশ করেছিল। আমরা জানি এই সময় টলস্টয় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন—পত্রগুচ্ছ টলস্টয়ের হাতে যদি পৌঁছতও, তিনি কতদূর উত্তর দানে সক্ষম হতেন জানি না। সেটি যদি সম্ভব হোত তবে উভয়ের প্রাজ্ঞ মনীষার ভাবদ্বন্দ্বে হয়তো বা ভারত-রুশ সম্পর্কটি আরও দৃঢ়তর হবার সুযোগ পেত।

ব্রিটিশ শাসন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মৌলিক দাবীনিচয়।

টলস্টয়কে প্রেরিত—তারকনাথ দাস

তুরস্কের সাম্প্রতিক রক্তপাতবিহীন বা শান্তিপূর্ণ বিপ্লবটি সাধিত হবার আগে পাশ্চাত্য জগৎ তরুণ তুর্কীদের স্বাদেশিক ক্রিয়াকলাপ ও কলাকৌশল সম্পর্কে অতি সামান্যই অবহিত ছিল। বস্তুতঃ এই আন্দোলনকে প্রায় সব জাতিই মনে করতেন বাস্তবে রূপায়ণের পক্ষে অসম্ভব একটা কিছু বলে এবং মানবতাবাদী এই মহান কর্মীদের গণ্য করা হত রক্তপিপাসু বিপ্লবী গোষ্ঠী হিসেবে। এমনকি, তুরস্কে একটি সাংবিধানিক সরকার ঘোষিত হবার পরও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান পত্রপত্রিকা গুলিতে এই অভিমত ব্যক্ত হল যে, এটি ঘোষণামাত্র এবং তা কোনদিনই বাস্তবে রূপায়িত হবে না। সকল শ্রেণীর সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সমেত নতুন পার্লামেণ্ট উন্মুক্ত হবার পর বলকান প্রশ্ন প্রসঙ্গে দলের কাজে বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায়। বর্তমানে চারদিক থেকেই দেশপ্রেমিকদের প্রশংসাগীতি নন্দিত হচ্ছে, জনসাধারণের জাতীয়তাবাদী আকুলতাকে উপলব্ধি করার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন তাদের বিজয় সম্পর্কে আবার ইংরেজ সরকার বিশেষভাবে উৎসাহী।

আমি বলতে চাই যে ভারত এখন রাজনৈতিক উত্তরণের একটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তার অবস্থা এখন অনেকটা তুরস্কের মত। তুরস্ক এবং ভারতের অবস্থার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তুরস্কে ছিল তার নিজেরই স্বৈরতন্ত্রী সার্বভৌম রাজতন্ত্রী শাসন। অপরপক্ষে ভারত রয়েছে একটি বিদেশী শাসনাধীনে, যারা লুঠপাট এবং উৎপীড়নে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত এবং সুসভ্য উপায়ে জনসাধারণের উপর স্বৈরতন্ত্র চালাচ্ছে।

ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সভ্য জগৎ অতি অল্পই জানেন।

লণ্ডন টাইমস এবং সার্বভৌম ব্রিটিশ প্রাধান্য সম্পর্কে আগ্রহী অন্যান্য পত্রপত্রিকা এই ধারণাকেই পোষণ করছেন, যে এটা একটা নৈরাজ্য-বাদী অন্দোলন, ঠিক যেমন ভাবে আব্দুল হামিদের দালালরা তরুণ তুর্কী আন্দোলনের অপব্যাখ্যা দিতে এবং খাটো করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ভারতে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে সে সম্পর্কে কয়েকটি সরল এবং অ-রঞ্জিত তথ্যকে এই নিবন্ধে আমি তুলে ধরব এবং এইভাবে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অন্যায় এবং স্বৈরাচারী কার্যকলাপ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত সেই সঙ্গে ইংরেজ প্রেসের কুতর্কের স্বরূপ উদ্ঘাটন করব এই আমার আশা।

প্রথমতঃ লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, ভারতীয় আন্দোলনে নৈরাজ্যবাদী কোন ব্যাপার নেই, কিন্তু এটি বিপ্লবী। এই আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ যাঁরা নৈরাজ্যবাদী বলে ধিকৃত অথচ আসলে যাঁরা জাতীয়তাবাদী, সেই তরুণদের সর্বপ্রধান নেতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষ বিচারকালে তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বিদেশী জোয়ালকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভারতের জনসাধারণের জন্য স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

নৈরাজ্যবাদ এবং বিপ্লবের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। নৈরাজ্যবাদীরা কোন ধরণের সরকারেই বিশ্বাসী নন, কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের নিজস্ব প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারী ব্যবস্থার বলিষ্ঠ প্রবক্তা। ভারতে কোন ন্যায্য অথবা প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার নেই। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের পচা গলা স্বৈরাচারী সরকারের পরিবর্তে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা চান তাঁদের নিজেদের একটি ভাল সরকার।

লর্ড মর্লে ভারতে প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহের সমর্থনে ভাষণকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আকাঙ্ক্ষাকে অভিহিত করেছেন "তাঁদের অশুভ অসৎ অভিলাষ" বলে। ব্রিটিশ জোয়ালকে ঝেড়ে ফেলা যদি

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ন্যায্য হয়ে থাকে, গ্রীকরা তুর্কীদের শাসন থেকে এবং ইটালী অষ্ট্রিয়ানদের শাসন থেকে যদি মুক্ত হতে পারে তাহলে ভারত ন্যায্যতঃই স্বাধীনতা দাবী করতে পারে। এই প্রসঙ্গে লণ্ডনের 'লেবর-লীডারেই' যথার্থভাবেই লেখা হয়েছে :—"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা-পুঞ্জের যে কোন জাতির স্বাধীনতা কামনা সর্বদাই অশুভ এবং অসৎ অভিলাষ বলে গণ্য হয়ে থাকে। তুরস্কের পার্লামেণ্ট প্রাপ্তিতে সহানুভূতিশীল ইংরাজ হৃদয় আনন্দে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ওঃ, নিশ্চয়ই রাশিয়ার জন্য স্বাধীনতা, তুরস্কের জন্যও স্বাধীনতা। কিন্তু ভারত কিংবা ইজিপ্টের স্বাধীনতা অচিন্তনীয় অথবা এক কথায় ইংল্যাণ্ডের যেখানে কোন স্বার্থ নেই এমন সব দেশের জন্যই স্বাধীনতা।"

ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিকরা তাঁদের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর যাথার্থ প্রতিপন্ন করার জন্য অসংখ্য যুক্তি তুলে ধরেন। এসবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটিকে সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় :—

(১) প্রত্যেক জাতিরই আছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। ব্রিটিশ জনগণের যদি "ব্রিটনরা কখনো দাস হবে না" গান গাইবার অধিকার থাকে এবং সেই নীতি অনুসারে কাজ করতে পারে, তাহলে ভারতীয়দেরও অধিকার আছে এই দাবী করার যে ভারত শুধু ভারতীয়দের জন্যই এবং সে উদ্দেশ্যে লড়বারও অধিকার আছে।

(২) বৃটিশ শাসনের অধীনে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি ভারতবাসীদের নৈতিক অবনতি ঘটিয়েছে। বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থকে সাহায্য করবার জন্য বৃটিশ সরকার মদ্যপান চালু করেছে এবং জনসাধারণকে বলপূর্বক আফিম চাষে রত করেছে। ভারতীয়দের জীবনী শক্তি ক্ষয় করছে এই আফিম ও মদ। ভারতীয় আফিম দিয়ে চীনকে কাবু করা হয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা দাবী করে থাকেন যে, এইসব অন্যায়ের প্রতিকার করতে হলে এগুলোর মূল উৎপাটিত করতে হবে, সেই মূল হচ্ছে বিদেশী সরকারের অপ-রূপ।

(৩) দুর্ভিক্ষ এবং প্লেগের মূল উৎস ভারতে যে জিনিসটি সেটি দারিদ্র। নিয়ত ভারতবাসীদের মধ্যে যে দারিদ্র ক্রমবর্ধমান—তার হেতু হিসাবে ব্রিটিশ সরকারকেই দায়ী করছে তরুণ ভারত। স্যার উইলিয়াম ডিগবী দেখিয়ে দিয়েছেন যে ১৮৫০ সালে ভারতীয় জনগণের গড় আয় ছিল দৈনিক চার সেণ্ট। ১৮৮০তে তা হ্রাস পেয়ে তিন সেণ্ট হয়েছিল এবং ১৯০০ সালে সেটি দৈনিক এক থেকে দেড় সেণ্টের মধ্যে ওঠানামা করেছে। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারত যখন দিনে দিনে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে যাচ্ছে তখন স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান এই যে দেশীয় জনগণের সেরা স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চয়ই ব্রিটিশ শাসন করছে না। এই জন্যই এর বদলে দরকার ভারতীয় জনগণের একটি সরকার। বিদেশী শাসন ভারতীয়দের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির পরিপন্থী। ব্রিটিশ ভারতের সরকারী দলিলে দেখা যায় যে শতবর্ষের ব্রিটিশ শাসন শেষে মাত্র ৯ শতাংশ ভারতীয় নিজের ভাষায় লিখতে পড়তে পারে। ভারতের স্বদেশপ্রেমিকরা এই শোচনীয় অবস্থার বিপরীতে দেখিয়েছেন জাপানের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমোন্নতি। গত চল্লিশ বছরে শতকরা নব্বই জন লিখতে পড়তে শিখেছে। এই কারণেই তিনশত কোটি জনসংখ্যা যে ভারতে সেখানে স্বাধীন সরকারের প্রয়োজন সহজেই বোঝা যায়।

(৫) পৃথিবীতে রুশ সরকার সর্বাপেক্ষা স্বৈরাচারী বলে গণ্য হয়ে থাকে কিন্তু রাজকীয় ভৌগোলিক সমিতির স্বর্ণপদকধারী পণ্ডিত অর্চিবণ্ড আর কল্কুহন, উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান প্রমুখ আরও পণ্ডিতদের অনুমোদিত তথ্যের সাহায্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে জারের সরকারের চাইতেও ভারতে ব্রিটিশ সরকার অনেক দিক থেকেই অধিকতর স্বৈরাচারী।

(৬) ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা বিতর্কাতীত প্রমাণের সাহায্যে তাঁদের এই দাবীকে দৃঢ়তর করে তুলেছেন যে ভারতীয় দেশীয় রাজাদের সরকার ব্রিটিশ সরকারের চাইতে এত বেশি উন্নত যে তুলনাই চলে না।

(৭) তাঁরা আরও দাবী করেন যে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের জন্য ব্রিটিশ সরকার অনেকাংশে দায়ী।

(৮) তাঁদের শাসকবর্গকে লজ্জা দিয়ে তাঁরা মিঃ থিওডোর মরিসনের মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির বিবৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন—"ভারতে ন্যায় বিচারের অপব্যবহার রাজনৈতিক অশুভের জনক। জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত, কেননা তাঁদের বিশ্বাস আইনসমূহ সমভাবে প্রযুক্ত হয় না।"

(৯) ভারতীয় জনগণ কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশেও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এমনকি অন্যান্য স্বাধীন জাতির জনসাধারণ যে সব সুযোগ সুবিধা উপভোগ করে থাকেন, তা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত।

মানবিক স্বাধীনতা এবং অধিকারের এই নতুন আন্দোলনটিকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতে সকল প্রকার দমন প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—(১) শিক্ষার অবদমন, (২) বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও শান্তিপূর্ণ সভাসমিতির স্বাধীনতা থেকে দেশীয় জনগণকে বঞ্চিত করা, এবং (৩) সামরিক শাসন প্রবর্তন ও কোনরকম বিচার ব্যতিরেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃগণের নির্বাসন।

আমরা নিঃশংকভাবে দাবী করতে পারি যে, ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত নীতিই হচ্ছে ভারতীয় জনগণের অধিকাংশের উদারভাবে শিক্ষালাভের বিরোধিতা করা, এই জন্যই এই সাম্রাজ্যে কোন পাব্লিক স্কুলের ব্যবস্থা নেই। ভারতীয় জনসাধারণ বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সরকার ইউনিভার্সিটি অ্যাকট পাশ করেছেন, যাতে করে উচ্চ শিক্ষা অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। অধিকন্তু, অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনচ্যুত করবার জন্য সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারী চিঠির একটি থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিলে এই

বক্তব্যের সমর্থন মিলবে :—

"মাননীয় উপাচার্য, সিণ্ডিকেটের নির্দেশে আমি জানাচ্ছি যে, এই স্কুলটির অনুমোদন যদি বজায় রাখতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম, এই গ্যারান্টি দিতে হবে যে, এটি ভবিষ্যতে সতর্কতা সহকারেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করবে। সেই অনুসারে সিণ্ডিকেট পরিচালক সমিতিকে এই আহ্বান জানাচ্ছেন যে, এই পত্রপ্রাপ্তির পক্ষকালের মধ্যে তাঁরা পরিচালক সমিতি এবং শিক্ষকগণের সকলের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র যেন জমা দেন, তাতে এই বিবৃতি দিতে হবে যে, বঙ্গ সরকারের সাধারণ বিভাগে মুখ্য সম্পাদকের নিকট প্রেরিত ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সম্পাদক স্যার হার্বার্ট রিসলে, কে. সি, আই ই.,সি.এস.আই এর স্বাক্ষরিত ১৯০৭-এর ৪ঠা মের ৩৩২ নং বিজ্ঞপ্তি পত্রের প্রদত্ত সর্ত্তগুলিকে বিশ্বস্ততা সহকারে পালন করে স্কুল পরিচালনা করতে তারা প্রস্তুত, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তারা কোনরকম রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগ দেওয়া বিষয়ে ছাত্রগণকে নিরুৎসাহ করতে সর্বদা সচেষ্ট হবেন।"

জনশিক্ষায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ। তাই দেখা যাচ্ছে যে, 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা', 'স্বরাজ' ও 'যুগান্তর' প্রমুখ সর্বাপেক্ষা শক্তি-শালী পত্রিকাগুলির কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে এবং বিগত ছমাসে তাদের ছাপাখানাগুলিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদক বালগঙ্গাধর তিলক, 'কাল' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ পুরুষোত্তম বাপুজী খাড়ে, 'কালের' ভূতপূর্ব সম্পাদক অধ্যাপক পরঞ্জাপ্পা, 'অরুণোদয়' ইণ্ডিয়ানহোমরুলার ও 'স্বরাজ', 'পাঞ্জাবী' প্রমুখ পত্রিকার সম্পাদকগণ এবং আরও অনেককে নিয়ে অন্ততঃ একশ'জন ভারতীয় পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রকের বিরুদ্ধে মামলা জারী হয়েছে এবং ভারতের ব্রিটিশ সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের অকপট

অভিমত ব্যক্ত করার অপরাধে তাঁরা কারারুদ্ধ হয়েছেন।

এই সব কঠোর বিধানেও সন্তুষ্ট না হয়ে ব্রিটিশ সরকার সম্প্রতি রাজদ্রোহ আইন পাশ করেছেন। এ বিষয়ে লণ্ডনের ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক লিখছেন :—

সরকারী অভিব্যক্তি অনুসারে বা মাঝারী জুড়িসডিকসন অ্যাকটকে রূপ দিচ্ছে সেই রাজদ্রোহ আইনের এই ৪নং ধারাটি কিন্তু ব্রিটিশ ন্যায়বোধের অনুরাগী সকলকেই বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলা এবং যাচাই করার অপেক্ষাধীন।—'ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশ ব্যতিরেকে ৩নং ধারার (১) নং উপধারা অনুযায়ী কোন তদন্ত কালে অভিযুক্তকে উপস্থিত করা হবে না, অথবা, এই ধরনের কোন তদন্ত কালে অভিযুক্তের সমর্থনে কোন উকিলও দেওয়া যাবে না, অথবা, এই ধরণের কোন তদন্ত চলাকালীন বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে কোন ব্যক্তির প্রবেশাধিকার থাকবে না।'

'মর্নিং লীডার' নামে একটি ইংরাজী সংবাদপত্র বিস্ময়োক্তি করেছেন—"এমন পরিস্থিতিতে আদৌ কোন তদন্ত অনুষ্ঠানের ঝামেলা করার দরকার কি!"

এই রাজদ্রোহ বিল প্রসঙ্গে 'ডেপুট' যথার্থই ঘৃণা ও ক্রোধ সহকারে মন্তব্য করেছেন—

"সম্প্রতি ভারতে ব্রিটিশ প্রাদেশিক শাসকগণ কর্তৃক গৃহীত অপরাধ বিরোধী নয়, ন্যায় বিরোধী। বিস্ময়কর জুরীর অনুশাসনটি সম্পর্কে পলম্যাল গেজেট আমি একটি বিবৃতি পাঠাচ্ছি।"

"তিনজন রাজকীয় মনোনীত বিচার কোন জুরী নয়। এমন কি কোন সাক্ষীও নয়! যে কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ইনফর্মারকে নিয়োগ করতে পারে 'বিচারের' দিনে সেই 'ইনফর্মার'কে লুকিয়ে রাখতেও পারে, এই যুক্তি দেখাতে পারে যে সে ব্যক্তি 'অনুপস্থিত' শুধু অভিযুক্ত ব্যক্তিরই স্বার্থে এবং এই সংবাদের ভিত্তিতে নির্দোষতম ব্যক্তিও ফাঁসিকাঠে অথবা সশ্রম কারাদণ্ডে প্রেরিত হতে পারেন!

"কোন অনুরূপ জারকে খোঁজার কোন প্রয়োজন নেই। এমন একটা অপরাধমূলক নির্বুদ্ধিতার সূচক অনুশাসন জারী করার মতো কোন মদ্যপ, উন্মাদ ও বদমাইশ রুশ জার কোনকালেই ছিলেন না। বাস্তবিকই কি ভারতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী নিজেদের অসীম মন্দস্বভাবকে প্রমাণিত করতে চান?"

বাক স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ গণসমাবেশ ঘটানোর অধিকার হরণ ভারতে একটা সাধারণ ঘটনা। ১৯০৯-এর ৫ই ফেব্রুয়ারীর শিকাগো পাব্লিকে বলা হয়েছে:

"ডিসেম্বরের শেষাংশে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যাতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তাকে দেশীয় জাতীয়তাবাদীদের সকলে প্রকৃত কংগ্রেস বলে মেনে নিচ্ছেন না। প্রায় একই সময়ে নাগপুরে আর একটি কংগ্রেস আহুত হতে পারত কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সেটিকে চেপে দেন। তাঁরা ১৯০৮-এর ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৯০৯-এর ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে সেই শহরে অথবা জেলায় যে কোন রকম সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন"

বিগত আঠার মাসে এগারো জন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীকে বিনা বিচারে ভারত থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে! এই অনুশাসনের প্রথম বলি হয়েছেন পাঞ্জাবের বিশিষ্টতম মানবপ্রেমী লালা লাজপত রায়। অন্যদের মধ্যে আছেন মিঃ অশ্বিনী কুমার দত্ত, এম এ, এবং মিঃ কৃষ্ণ কুমার মিত্র বি. এ যাঁরা অত্যন্ত প্রভাবশালী। মিঃ দত্ত একটি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, এবং সমগ্র বাখরগঞ্জ জেলায় তিনি গ্রাম্য সালিশি আদালত সংগঠন করেছেন। গ্রেপ্তার হবার আগে পর্যন্ত মিঃ দত্ত ছিলেন মাতৃভাষায় প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিকের সম্পাদক এবং কালকাতার সিটি কলেজের অধ্যক্ষ। অবশিষ্টদের মধ্যে যাঁর নাম সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তিনি হলেন বাঙালী লক্ষপতি সুবোধ চন্দ্র মল্লিক যিনি বিগত কয়েক বছর ধরে জাতীয়তাবাদী কারণে প্রভুত অর্থ দান

করেছেন। বছর তিনেক আগে সরকারী কলেজগুলি ছাড়াই স্বাধীনভাবে উচ্চতর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যখন জাতীয় শিক্ষাপর্ষদ চালু হয় তিনি সেই আন্দোলনে ৩৩, ৩৩৩ পাউণ্ড দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন বন্দেমাতরম পত্রিকার প্রধান খুঁটি। মিঃ এস সি চক্রবর্ত্তী হচ্ছেন একজন সাংবাদিক, যিনি অনেকগুলো জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত। তিনি ছিলেন চলিত বাংলায় লেখা বিশিষ্ট পত্রিকা 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক যে পত্রিকা কলকাতার পথে পথে নামমাত্র মূল্যে হাজার হাজার কপি বিক্রয় হত এবং বন্দেমাতরম ছেড়ে আসার পর মিঃ বিপিন চন্দ্র পাল এই পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। সম্প্রতি নতুন প্রেস আইন অনুসারে এই দুটো পত্রিকার প্রকাশই ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিন দাস হচ্ছেন ঢাকার একজন তরুণ ব্যবহারজীবী ও অনুশীলন সমিতির সম্পাদক।

এই সব মহান ও স্বদেশপ্রেমী নেতৃবৃন্দ ও আরও অনেকে ১৮১৮ এর ৭ই এপ্রিলের একটি বিধি অনুসারে নির্বাসিত হয়েছেন। এই বিধিটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ। আমি প্রস্তাবনা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি, যা পরিষ্কারভাবে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছে: "বিদেশী শক্তিসমূহের সঙ্গে গড়ে ওঠা মৈত্রী সম্পর্ক যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, দায়িত্বাধিন দেশীয় নৃপতিদের এলাকায় শান্তি রক্ষার জন্য এবং বিদেশী বৈরিতা ও অভ্যন্তরীণ অশান্তির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের নিরাপত্তা রক্ষার রাষ্ট্রীক কারণে ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিধিনিষেধ আরোপিত হতে পারে যাঁদের অথবা যাঁর বিরুদ্ধে কোন বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা নেবার মত যথেষ্ট কারণ নেই, অথবা বিশেষ কোন কারণ বশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে এধরনের কোন বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কিংবা যথার্থ নয়। এবং এতদ্বারা উল্লিখিত বিধিনিষেধের নিরূপণ করা হবে পর্ষদস্থ গভর্ণর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে।"

মিঃ রুজভেল্টের সঙ্গে একমত হয়ে সাধারণভাবে জনগণ এমনকি

আমি নিজেও মনে করি যে ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ সরকার আশীর্বাদ-স্বরূপ, কেননা এটি জনসাধারণকে নাগরিক অধিকার উপভোগের গ্যারান্টি এনে দিয়েছে। কিন্তু বিচারবিভাগীয় পরখের অধিকারকে অস্বীকার করে এমন সব আইনের প্রবর্ত্তন অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিচ্ছে যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ জনগণের চাইতেও কম স্বাধীনতা উপভোগ করে বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবাসী। রুশ সরকার রুশ বিপ্লবীদের জন্য কোন না কোন ধরনের আদালতের বিচার বরাদ্দ করেছেন, কিন্তু ভারতীয় দেশপ্রেমীদের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার এমন কি একটি বিচারের ভান পর্যন্ত দেখাতে পারছেন না।

ভারতে অধুনা যা চলছে, সেই বিয়োগান্ত কাহিনীর একটি নগণ্য অংশমাত্র উপরিউক্ত এই আলোচনাটুকু।”

নবীন ভারতের প্রতি বার্তা

লিও টলস্টয় প্রেরিত

প্রথম পর্যায়

(ক)

আপনার চিঠি ও ম্যাগাজিনের সংখ্যা দুটি পেয়েছি। দুটোই আমার কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছে। বাস্তবিক সংখ্যাগরিষ্ঠের উৎপীড়নের ঘটনাটি আমার মনকে নাড়া দিয়েছে এবং এইটিই আমার ধ্যান ধারণা। আপনার চিঠি এবং হিন্দু ম্যাগাজিনের দুইটি সংখ্যায় উল্লিখিত ভয়াবহ বিপত্তির কারণসমূহ বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে বুঝাতে চেষ্টা করব। অধিকাংশ শ্রমিক মুষ্টিমেয় অলস ব্যক্তির অধীন হওয়ার কারণগুলি আশ্চর্যজনক। এদের কাছে শ্রমিকরা শুধু শ্রমই দান করে না, তাদের জীবনান্তও হয়। সর্বত্রই, এই ঘটনা ঘটছে। অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত একই জাতিভুক্ত হতে পারে। কিংবা প্রভাবশালী শ্রেণী সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশের হতে

পারে—যেমনটি দেখা যায় ভারত ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে।

ভারতের পক্ষে এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে অদ্ভুত বলে মনে হয়। কারণ ভারতের বিশ কোটি অধিবাসী যারা কিনা আধ্যাত্মিক ও দৈহিক বলে অনেক বেশী উন্নত তারা আজ ছোট জোটের অধীনে, যারা চিন্তায় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় অনেক নীচুমানের তাদেরই দাসত্ব করছে।

আপনার চিঠি, ফ্রি হিন্দুস্থানের প্রবন্ধাবলী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের অতীব চিন্তাকর্ষক লেখনী থেকে এর কারণ সমূহ বোঝা যায়। এই কারণগুলিই বর্তমানকালে সব লোকেরই দুঃখের মূল। যে শিক্ষা সমভাবে মানবজীবনের অর্থ এবং চরিত্র গঠনের জন্য শ্রেষ্ঠ নিয়মাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা করত সেই যুক্তিমূলক ধর্ম শিক্ষার অভাবে এবং তার পরিবর্তে মিথ্যাধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্ব্যর্থক উক্তিসমূহ ব্যবহার করে ভুল সিদ্ধান্তগুলিকে সভ্যতা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আপনার চিঠি, ফ্রি হিন্দুস্থানের প্রবন্ধাবলী, এবং হিন্দুদের সকল রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্য হ'তে এটাই প্রতীয়মান হয় যে অধিকাংশ হিন্দুধর্মের শিক্ষা যা হিন্দুদের স্বীকৃত ছিল এবং এখনও স্বীকৃত তার উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ করে না। এখন জননেতাগণ ইংরেজ এবং ছদ্মনাম-ধারী খৃষ্টানজাতির অধার্মিক এবং অসৎ জীবন প্রণালী গ্রহণ করে। দেশীয় লোকদিগকে ইয়োরোপীয় জীবন প্রণালী অনুসরণ করবার প্রবণতা থেকেই হিন্দু নেতাদের ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা দেখা যায়।

সেই প্রকৃতধর্ম যা চরিত্র গঠনের শিক্ষা দেয় সেই ধর্ম সচেতনার অভাব বর্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে জাপান, ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় পরিলক্ষিত হয়, ধর্মের অভাবই ইংরাজ কর্তৃক ভারতীয়দের পরাধীনতার একটি প্রধান কারণ। মূল কারণ নয়।

(খ)

আমার এই ভাবধারা স্বচ্ছ করবার জন্য বহু বছর আগেকার কথা বলতে হবে। আমরা জানিনা কী ভাবে লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে মানব জাতি বাস করত। যতটুকু জানি তাতে দেখতে পাই মনুষত্ব বা মানবতা বিভিন্ন জাতি, উপজাতি এবং গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক স্পষ্টতঃ অনিবার্য পরিবেশে এক বা একাধিক ব্যক্তির জবরদস্ত শাসনাধীন হয়েছিল। বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন ব্যক্তির মত পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা জানি এই ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। মানব জীবনের সংগঠনধারা ঠিক এইভাবেই সবদেশেই প্রবহমান। পূর্বের ইতিহাসে জানা যায় যে তখনও ঐ প্রকার জীবনের ধারাই ছিল শাসক ও শাসিতের দ্বারা একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজের মিলনের ভিত্তি। এই ব্যবস্থা সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বহু শতাব্দী এই জীবন প্রণালীর অস্তিত্ব সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে জবরদস্তি শাসনই ছিল কেন্দ্রীয় শক্তি।

আধ্যাত্মিক উৎস জীবনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা যায়। এটাই প্রকৃত জীবন। এই আধ্যাত্মিক প্রেরণা প্রত্যেক ঘটনাকে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রবণতা এনে দেয় এবং প্রেমের দ্বারা এই ঐক্য সাধিত হয়। এই ভাব নানাভাবে, নানা সময়ে কমবেশী সম্পূর্ণতায় কিংবা স্পষ্ট-ভাবে নানাস্থানে প্রতিভাত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে, ইহুদী ধর্মে, জোরা-ষ্টারের ধর্মনীতিতে, বৌদ্ধধর্মে, তাও ধর্মে, কনফুসীয় ধর্মে, গ্রীস ও রোমের মনীষীদের রচনায়, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মে এই আধ্যাত্মিক ভাবের উল্লেখ আছে।

ঐ একই ভাব বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন জাতিতে এবং বিভিন্ন দেশে প্রকট হওয়ায় এই ভাব যে মানব প্রকৃতিতেই নিহিত এবং সত্যের বহিঃপ্রকাশ তা বোঝা যায়। কিন্তু যারা সমাজে লোকেদের ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য উৎপীড়নকেই একমাত্র উপায় বলে মনে করত তারা সত্যকে (আধ্যাত্মিকভাবে) বর্তমান জীবন প্রণালীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ

নীতি বলে গ্রহণ করেছিল। এইভাব প্রথমে অতি স্পষ্ট এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত ছিল। জনগণ একে একটি মতবাদরূপে গ্রহণ করলেও চরিত্রগঠনের জন্য এটি একটি প্রভুত্বব্যঞ্জক উপদেশ বলে মনে করত না। যাদের জীবনের ভিত্তি ছিল উৎপীড়ন তাদের কাছে এই সত্য ঘোষিত হলেও সেই একই ঘটনা ঘটতে লাগল। যথা যারা ক্ষমতা পেয়ে সুবিধা ভোগ করত তারা জনগণকে এই সত্য স্বীকার করায় দেখল তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তারা এই সত্যকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নানা উপায়ে উৎপীড়নের দ্বারা এর বিস্তার বন্ধ করল। এই সত্য মানবতার জন্য স্বাভাবিক এবং মানব জীবনকে আধ্যাত্মিক নীতির দ্বারা পরিচালিত করে। মানব জীবনের ভিত্তি স্বরূপ এই সত্য এবং প্রেমের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। এই সত্যের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত বিকৃতিই নয়, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত উৎপীড়ন এবং শাস্তির দ্বারা কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত ধর্ম গ্রহণেও বাধ্য করা হত। এই নীতি সত্যের পরিপন্থী। এই সত্যের ভুল বর্ণনা এবং অসম্পূর্ণ সত্যের প্রভাব কনফুসীয়, তাও, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলাম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দেখা যায়।

(গ)

এই ঘটনা সর্বত্র ঘটেছে। প্রেম শ্রেষ্ঠ নৈতিক ভাব বলে সর্বজন গৃহীত হলেও বহু বিচিত্র মিথ্যার সংমিশ্রণের ফলে এর সত্যরূপের কোনোও অস্তিত্বই নেই। এরকম মতবাদ প্রচলিত ছিল যে এই শ্রেষ্ঠ নৈতিক ভাব ব্যষ্টি জীবনে শুধু সাংসারিক বিষয়েই প্রযোজ্য। সর্বপ্রকার উৎপীড়ন, কারাদণ্ড, প্রাণদণ্ড, যুদ্ধ প্রভৃতি প্রেমের সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও সংখ্যাগুরুদের দুষ্কর্মের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য তা অপরিহার্য্য। তা সত্ত্বেও সাধারণ জ্ঞানে স্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে, একদল লোক অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদের সমষ্টির কল্যাণের জন্য সর্বপ্রকার উৎপীড়ন করা উচিত বলে দাবী করার ক্ষমতা রাখে। স্বভাবতঃ ঐ অল্প সংখ্যক উৎপীড়িত ব্যক্তিগণও শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে একই সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করতে পারে। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ এবং বিশেষতঃ খৃষ্ট প্রচারকগণ প্রেমের এই বিকৃতরূপ বুঝতে পেরে প্রেমের অনিবার্য অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিলেন। যথা অন্যায়কে অন্যায় দ্বারা প্রতিহত করা অপরদিকে অপমান, আঘাত এবং সর্বপ্রকার উৎপীড়ন সহ্য করা। এই অসঙ্গত নীতি জনগণ স্বীকার করল। প্রেমের দ্বারা পরোপকার করা এবং তারই সঙ্গে অন্যায়কে অন্যায় দ্বারা প্রতিহত করা প্রেমের পরিপন্থী। এই সকল সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ধর্মনীতি জনগণ এত গভীরভাবে বিশ্বাস করত যে উৎপীড়নভিত্তিক জীবন প্রণালীর অবৈধতা সম্বন্ধে, কোনও প্রশ্ন করতে পারত না। ফলে একদল অপর দলের প্রতি শুধু উৎপীড়ন করত না, মৃত্যু দণ্ডও দিত।

জনগণ বহুকাল যাবৎ প্রেম নীতির এই অসঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য না করেই জীবন যাপন করত। কিন্তু এমন দিন এল যে বিভিন্ন জাতির চিন্তাশীল নেতাদের মনে এই অসঙ্গতি আলোড়ন সৃষ্টি করল। কোন-প্রকার উৎপীড়ন ও হত্যা না করে একে অপরকে সাহায্য করবে, ভালবাসবে এই প্রাচীন সহজ সত্য জনগণের মনে উদ্ভাসিত হল এবং প্রতিদিনই এই ভাব স্বচ্ছ হতে লাগল। পূর্বের প্রেমের মিথ্যা ব্যাখ্যার স্বীকৃতি ক্রমশঃ মন থেকে দূরীভুত হল।

প্রাচীনকালে তথাকথিত সম্রাট, জার, সুলতান, রাজা, শাহ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানগণ ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তির মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উৎপীড়নকে ন্যায়সঙ্গত মনে করতেন। কিন্তু ক্রমশঃ সম্রাটগণের ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তির প্রতি জনগণের বিশ্বাস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হল। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং কনফুসীয় ধর্মে এই বিশ্বাস সমানভাবে একই সঙ্গে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। পূর্বে এই নীতি (Theory of Divine Right) ন্যায়সঙ্গত মনে করে সাধারণজ্ঞান এবং ধর্মভাবকে উপেক্ষা করা হত। এই নীতি যে অসম্ভব এবং ব্যাভিচারদুষ্ট—জনগণ পরিষ্কারভাবে তা বুঝতে পারল। কারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হত এবং বৈষয়িক কল্যাণ ও ধর্মভাবকে বিনষ্ট

করা হত। কাজেই এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে জনগণ এই পুরোহিত তন্ত্র সমর্থিত শাসকদের ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে মুক্তির পথ খুঁজবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সম্রাটগণ ঐ দৈবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে রাজ্য শাসনে প্রজাদের নিকট থেকে সমস্ত সুবিধা ভোগ করতেন এবং ঐ দৈবশক্তির ছদ্মবেশধারী বহু ব্যক্তি বিচারালয়ে শাসকের ছদ্মবেশে—শ্রমিকদের শোষণ করে জীবনধারণ করতেন। আগেকার সম্রাটরা ধর্মের নামে প্রতারণা করে ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তির দ্বারা যে শাসন চালাচ্ছিল তার প্রভাব এখন নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে ঐ শ্রেণীর শাসকগণ পূর্বের শাসনতন্ত্রের স্থানে অপর একটি প্রতারণাপূর্ণ শাসনতন্ত্র গঠন করে পূর্ববর্তী শাসকদের মত ঐ একই উপায়ে জাতিসমূহকে দাসত্বে পরিণত ক'রছে।

(ঘ)

ধর্মের নতুনতর চিন্তাধারা সেকেলে চিন্তা পরিত্যাগ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পেছনে ফেলে আসা মতবাদগুলোর ভিত্তি যেমন যুক্তিহীন, এই নতুনরূপে দেখা দেওয়া মতবাদগুলোর যুক্তিও তেমনি যুক্তিহীন, শুধু তাদের দাবী যে তারা নতুন। এই অভিনবত্বের জটিল জালে আচ্ছন্ন থাকায় তাদের অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যগুলো জনসাধারণের কাছে সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে না, উপরন্তু যারা ঃইগুলো প্রচার করে তারা শক্তিমান দল এবং তাদের প্রচার কাজও খুব কৌশলী। যে কারণে এই মতবাদগুলোর সমর্থনে যুক্তিগুলি বহুলোকের কাছে অকাট্য বলে মনে হয়। এনমকি যারা এই মতবাদগুলোর কবলে পড়ে পর্যু্যদস্ত হয়, তারাও এই যুক্তিগুলোকে অখণ্ডনীয় বলে মনে করে। এই নতুন সমর্থিত যুক্তিগুলোর নাম দেওয়া যাক 'বিজ্ঞান-ভিত্তিক'।

"বিজ্ঞান" এমন একটি কথা, যা বেশীরভাগ লোককে 'ধর্ম'কথাটির মতনই প্রভাবাচ্ছন্ন করে। কেবলমাত্র এই কারণে একে 'ধর্ম' নামে

অভিহিত করা হয়। সাধারণ লোকের কাছে 'ধর্ম'নামে পরিচিত সব কিছুই নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সত্য, ঠিক যেমন 'বিজ্ঞান' নামে পরিচিত সব কিছুই সাধারণ লোকের কাছে অবিসম্বাদীরূপে সত্য। আপাতঃ দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত, ধর্মমতগুলোর অন্তর্গত 'শক্তিবাদের' ন্যায়ানুগ সমর্থনগুলো এখনও নির্ভর করে ধর্মের এক বিষম বিকৃতির উপর। এই বিকৃতির মূল কথা হল, ভগবানের সকল বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় বলীয়ান ব্যক্তিদের ভেতর কারণ তারা ভগবানের দ্বারাই এই বলীয়ান পদে অভিষিক্ত হয়েছে। সুতরাং নির্বিচারে বলপ্রয়োগ ভগবৎ নির্দিষ্ট।"

"কোন শক্তিই ঈশ্বর নিরপেক্ষ নয়" এই তত্ত্বটির স্থান গ্রহণ করল শক্তিবাদের নতুন বিকৃত সমর্থন। এই নতুন যুক্তির প্রথম ভিত্তি হ'ল জাগতিক ঘটনা। চিরকালই এক দলের উপর আরেক দল জোর জুলুম খাটিয়ে আসছে সুতরাং এই প্রমাণিত হয় যে এই জোরজুলুমবাদ অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতেই থাকবে। মানুষের উচিত হবে ভাবপ্রবণ অর্থহীন ন্যায়বোধ এবং বিবেকচেতনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যা চিরকাল চলে আসছে তাকেই মেনে নেওয়া এবং এটাই হল বৈজ্ঞানিক ভাষায় "ঐতিহাসিক সত্য"। দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তি উদ্ভিদ ও জন্তু জগৎ, যেখানে মাৎস্যন্যায় পূর্ণভাবে বর্তমান, যেখানে জীবনযুদ্ধে শুধু তারাই টিকে থাকে যারা এই যুদ্ধে সর্বোত্তম। সুতরাং সেই যুদ্ধ মানুষের ভিতরেও চলতে থাকবে। থাকুক না কেন তাদের ভেতর বিশেষ বিশেষ কতগুলো গুণ, যেমন নীতি, জ্ঞান ও প্রেম। যে জগৎ কেবলমাত্র পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা অনুশাসিত সেখানে এই গুণগুলো অবর্তমান। 'জোর যার মুলুক তার' তত্ত্বের এটি দ্বিতীয় সমর্থন যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক।

তৃতীয় বৈজ্ঞানিক সমর্থন শক্তিবাদের এই যুক্তিটি সকলের চোখে সহজেই পড়ে এবং দুর্ভাগ্যবশত এই যুক্তিটি সব চাইতে বেশী প্রচলিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা অতি পুরাতন ধর্মীয় যুক্তি শুধু একটু

অদল বদল করা হয়েছে। মতবাদ হিসাবে এর খুঁটি সেই অতি পুরানো যুক্তি, যার মূল কথা হল—সামাজিক জীবনে কয়েকজন লোকের মঙ্গলের জন্য অন্য জনকতকের ওপর জোর জুলুম করতেই হয়, প্রেম ভালবাসা যতই কাম্য হোক না কোন, জুলুমবাজী অপরিহার্য। তথাকথিত বিজ্ঞান দ্বারা শক্তিবাদের এই সমর্থন এবং ধর্ম্মভিত্তিক শক্তিবাদের মধ্যে তফাৎ যেটুকু আছে তা হোল,—বিজ্ঞান যেভাবে কতক বাদ দিয়ে অন্য কতকের ওপর বলপ্রয়োগের কারণ দেখাতে বা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে ধর্ম সেভাবে করে না। এই শক্তিবাদ তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলো ন্যায়ানুগ শুধু এই কারণেই নয় যে সেগুলো স্বর্গীয় শক্তির আধারস্বরূপ ব্যক্তিদের দ্বারা উচ্চারিত ও প্রচারিত হয়েছে। এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলো অধিকাংশ ইচ্ছা বা ইচ্ছাশক্তির প্রতিভূ, যা রাষ্ট্র তান্ত্রিক সরকারে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সুতরাং শক্তি পদে প্রতিষ্ঠিত দলের সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং কার্য্যাবলীর ভেতর দিয়ে এই মতবাদ গুলো আত্মপ্রকাশ করে বলে ধরে নেওয়া যায়।

এইগুলোই হল জুলুমবাজীর তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পূর্ণ-জাগরণের যুক্তি। জুলুমবাজ সমর্থিত যুক্তিগুলো নতুনভাবে সাজানো হলেও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিন্তু ওপরতলার লোকেদের কাছে এই যুক্তিগুলো অপরিহার্য্য। কারণ তারা এগুলোতে বিশ্বাস করে প্রায় অন্ধের মত এবং সেগুলো প্রচার করে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে যেমন আগেকার লোকেরা প্রচার করত নিষ্পাপ মাতৃত্বের-তত্ত্ব।

অন্যদিকে এই ধরণের সরকারের অধীনে শ্রম ও মানসিক কষ্টে জর্জরিত জনসাধারণ এই সমস্ত বিজ্ঞানভিত্তিক সত্যসমূহের প্রচারের জাঁকজমকে হকচকিয়ে যায় এবং অতি স্বচ্ছন্দে এগুলো মেনে নেয় যেমন তারা আগে মেনে নিত তথাকথিত ধর্মভিত্তিক যুক্তিগুলোকে। এবং ঠিক আগের মত এই সমস্ত নতুন শক্তিধরদের কাছে ক্রীতদাসের মত মাথা পেতে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। আগেকার অত্যাচারী পুরোহিতদের তুলনায় এই নতুন শক্তিধররা আরও বেশী নিষ্ঠুর। অবশ্য

এও স্বীকার করতে হবে যে, এই শক্তিধরদের সংখ্যা অধুনা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৬)

খ্রীষ্টান জগতে অতীতে এরূপই ঘটেছিল এবং এখনও এ রূপই ঘটছে। এরূপ আশা করা অন্যায় হবে না যে, বিরাট ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং কনফ্যুসীয় জগতে এই নতুন তথাকথিত বিজ্ঞানভিত্তিক কু-সংস্কারের কোনও স্থান হবে না। এটাও আশা করা অন্যায় হবে না যে, চীনা, জাপানী এবং হিন্দুরা যাঁরা বহুদিন আগে থেকেই ধর্মের ভণ্ডামীর অসত্য উপলব্ধি করছেন তাঁরা প্রাচ্যের মহান ঋষিদের দ্বারা উপলব্ধ মানুষের স্বভাবজাত প্রেমের পথে বিনা দ্বিধায় সরাসরি আগুয়ান হবে না।

কিন্তু কার্য্যত এটাই দেখা যায় যে ধর্মীয় কুসংস্কারকে স্থানচ্যুত করে যে বিজ্ঞানভিত্তিক কুসংস্কার প্রকাশ পেয়েছে তা ক্রমশ প্রাচ্য জগতেও দৃঢ়তর হচ্ছে। বিশেষ করে প্রাচ্য জগতের শেষ প্রান্তে জাপানে এই কুসংস্কারগুলি শুধু যে নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রভাবাচ্ছন্ন করেছে তা নয়, জনসাধারণের ভেতর অধিকাংশই ঐ একই ভাবে প্রভাবাচ্ছন্ন। এই অবস্থাকে ভীষণতম দুর্বিপাকের সংকেত বলে মনে করা যেতে পারে।

চীনও এর চল্লিশ কোটি অধিবাসী সত্ত্বেও এ রূপ চিন্তাধারা কবলস্থ হয়েছে এবং তোমাদের ভারতবর্ষেও কুড়ি কোটি অধিবাসী থাকা সত্ত্বেও ঐ বিকৃত চিন্তাধারার দ্বারা আচ্ছন্ন। অন্তত যাদের নেতা বলা হয় এবং তোমরাও নেতা বলে মানো, তারা এই কুসংস্কারে ব্যাধিগ্রস্ত।

তোমাদের পত্রিকায় নীতি হিসাবে একটা উক্তি বসিয়েছ যা দেশের জনসাধারণের কার্যাবলীর পরিচালনার মূল ভিত্তি, সেটা হল এই যে, আক্রমণের বিরূদ্ধে বাধা দান শুধু যে সমর্থনযোগ্য তা নয়, উপরন্তু অবশ্য

কর্তব্য। অপ্রতিকার পরোপকারবাদ এবং আত্মোৎকর্ষসাধন উভয়কেই সমানভাবে ব্যাহত করে।

তোমরা বল যে, ইংরেজরা হিন্দুদের দাসত্বে পরিণত করেছে, কারণ হিন্দুরা যথেষ্ট বাধাদান করেনি এবং এখনও শক্তিবাদকে বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা বাধাদান করছে না।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টোধরণের। যদি ইংরেজরা হিন্দুদের দাসে পরিণত করে থাকে, এর একমাত্র কারণ হল যে, হিন্দুরা জুলুমবাজীকে স্বীকার করে নিয়েছিল এবং এখনও করে তাদের সমাজ বিধানের মূল এবং ভিত্তিমূলক নীতি হিসাবে। এই নীতির নামে তারা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। এই নীতির নামেই তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এমনকি ইউরোপীয় এবং ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং বর্তমানে তারা তাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবার জন্য তৈরী হচ্ছে।

একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্বাধীন হিন্দুস্থানকে (লোকসংখ্যা কুড়ি কোটি) দাসত্বে পরিণত করল। এই কথাগুলো একটি কুসংস্কারমুক্ত লোককে বললে সে বুঝতেই পারবে না এই কথাগুলোর অর্থ কি। সে বুঝতে পারবে না এটা কিভাবে সম্ভব যে মাত্র ত্রিশ হাজার লোক যারা শক্তি চর্চায় বীর্যবান নয় এবং, বাহ্যিক দৃষ্টিতে পীড়াগ্রস্ত তারা কিনা কুড়ি কোটি স্বাস্থ্যবান, সবল কৌশলী, স্বাধীনতাপ্রিয় লোককে দাসত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলল? এই সমস্ত সংখ্যায়ন কি এই প্রমাণ করে না যে, ইংরেজরা নয় বরং হিন্দুরাই নিজেদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল?

শুঁড়ির দোকান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমরা পানাসক্ত হয়ে পড়েছি—এই ধরণের যুক্তি দেখান যেরকম অর্থহীন ঠিক সেইরকম অর্থহীন এই অভিযোগ করা যে ইংরেজরাই এসে আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল পরাল। তুমি যদি মাতালদের বল যে তোমরা তো মদ্যপান না করলেই পারতে, তখন মাতালরা উত্তর দেবে যে তাদের মদ্যপানের

স্বভাব এতই গেড়ে বসেছে যে তাদের পক্ষে মদ্য পান না করে থাকা অসম্ভব। উপরন্তু এই মদ্যই তাদের সমস্ত উদ্যম শক্তি জাগিয়ে রাখে। এটাই কি সেই অবস্থার সমতুল্য নয় যেখানে নিজ জাতির বা বিদেশীয় কয়েকশত বা সহস্র লোকের কাছে সমগ্র জাতিটাই বশ্যতা স্বীকার করে?

যদি এই সত্য হয় যে, হিন্দুরা বলপ্রয়োগ প্রভাবে দাসত্বে পরিণত হয়েছে, তাহলে তার একমাত্র কারণ মানুষের সহজাত প্রেম, ভালবাসার শাশ্বত নীতি বিসর্জন দিয়ে বলপ্রয়োগের দ্বারাই তাঁরা এতদিন বেঁচেছিলেন এবং এখনও বেঁচে আছেন।

যে ধন হাতের মুঠোয়, অজ্ঞ লোক যখন সেই ধনই খুঁজে বেড়ায়, তখন সত্যিই সে কৃপার পাত্র। সেই রকম শান্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকও কৃপার পাত্র, কারণ সে জানে না যে করুণাময় ভগবান তার ভোগের জন্য প্রেম ও ভালবাসার আবেষ্টনীর মধ্যে সেই অপার শান্তি সাজিয়ে রেখেছেন।

প্রেমের নীতির ভেতর অপ্রতিরোধ নীতিও অন্তর্ভুক্ত। এই প্রেমের নীতি বহুদিন আগেই ভগবৎ প্রেরণায় হিন্দুরা লাভ করেছে এবং একজন হিন্দুর কাছে এটাই তার অন্তঃকরণের এক উজ্জ্বল মণি। সুতরাং যে এই প্রেম নীতি অনুসারে জীবনযাপন করে তার পক্ষে কি করে সম্ভব হয় বলপ্রয়োগের নীতির ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়া? তাই বলি, কোন অন্যায়কে বাধা দেবার চেষ্টা থেকে বিরত হও, এবং নিজেও কোনও অন্যায় সাধনে অংশগ্রহণ করো না। এই অন্যায় দেশ শাসনের নামে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে হতে পারে, বিচারালয়ের বিধানে হতে পারে, কর সংগ্রহের ব্যাপারে হতে পারে এবং সর্বোপরি যুদ্ধবৃত্তির মধ্যেও হতে পারে। এটা যদি তোমার জীবনে প্রতিফলিত করতে পার, দেখবে পৃথিবীতে কারও সাধ্য নেই তোমাকে বশ্যতায় আনতে পারে।

প্রেমই একমাত্র উপায় যা মানুষকে অনেক দুর্বিপাকের হাত থেকে

রক্ষা করতে পারে। তোমাদের কৃষ্ণ কথার মধ্যে এটাই দেখতে পাওয়া যায় যে মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারে শুধু এই প্রেম। অনেক অনেক যুগ আগে তোমাদেরই দেশে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় গভীর নিনাদে ঘোষিত হয়েছিল যে প্রেমই ধর্ম, প্রেমই জীবনের মূল ভিত্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে তোমরা যারা ধর্মচিন্তার সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত, আজ লঘু অন্তঃকরনে তথাকথিত বিজ্ঞানের আলোকে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে নিজেদের অভ্রান্ত ভেবে তদনুরূপ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে যা করছো তা ন্যায়সঙ্গত ভেবে, সেই প্রেমের নীতিকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, (আমার এরূপ বলার জন্য আমাকে ক্ষমা করো) তোমরাও সেই প্রকাণ্ড ভুল করছো—যে ভুল শক্তিবাদের সমর্থকরা যারা প্রকৃত সত্যের প্রধানতম শত্রু তারাও করে এসেছে। প্রথমে ধর্মের দাসরূপে, পরে বিজ্ঞানের দাসরূপে তোমাদের ইউরোপীয় শিক্ষকগণ তোমাদের ভেতর এই প্রকাণ্ড ভুল অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়েছেন।

(চ)

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মানব সমাজে সেই একই জিনিস ঘটেছে, যা ঘটে থাকে যে কোনও ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে—যখন সে এক অবস্থা অতিক্রম করে অন্য অবস্থায় পৌঁছয় (যেমন শিশু যখন যুবক হয় যখন বয়স্ক হয়) এবং এইরূপে যা তার জীবনের এতাবৎ পথ প্রদর্শক হয়েছিল তাকে হারায়। যে পথপ্রদর্শককে সে হারিয়ে ফেলল তার স্থানে তার বয়সোপযোগী নতুন পথপ্রদর্শক না পেয়ে জীবনের পথে হালবিহীন, নৌকার মত চলতে বাধ্য হয়। এর ফলে আসে নানারকম ব্যাকুলতা, দুশ্চিন্তা, আমোদ প্রমোদের নতুন পন্থা অনুসন্ধান এবং নতুন উত্তেজনা। এগুলো তার নিজেরই দুঃখময়, স্বার্থপর জীবনের ওপর পর্দা টেনে দেবার জন্য প্রয়োজন হয়। এই রকম অবস্থা বহু যুগ ধরে চলতে পারে।

মানুষের বয়ঃসন্ধি অতিক্রম করবার সময় ব্যক্তি জীবনে বিপর্যায় এসে পড়ে। কারণ এই সময় অনিবার্য্যরূপে এমন এক সময় এসে পড়ে যখন জীবন আর পুরান খাদে চলতে পারে না। তখন সে হৃদয়ঙ্গম করে যে আগেকার পথের দিশারীর ইঙ্গিত আর তার পক্ষে গ্রহণীয় নয়—ফলে তাকে অর্থবিহীন দুশ্চিন্তা আর জ্বালা যন্ত্রণায় দিন কাটাতে হয়। যদিও এইরকমই ঘটে থাকে তবুও এটা প্রমাণিত হয় না যে, তাকে বাধ্য হয়েই কোন ন্যায়পরায়ণ পথপ্রদর্শকের নীতি ছাড়াই চিরকাল জীবনের পথে চলতে হবে। বরঞ্চ এটাই স্বাভাবিক যে সেই ব্যক্তি নিজের বয়সানুযায়ী একটা জীবননীতি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে এবং তাতে সফলকাম হলে ঐ নীতিটিকে প্রোজ্জ্বল করে তুলে পরিণত বয়সে অনুসরণ করবার চেষ্টা করবে।

মানবজাতির নিয়ত পরিবর্তনশীল জীবনেও এইরকম বিপর্যয় সমূহের প্রাদুর্ভাব অনিবার্য। আমার মত এই যে, আজ ১৯০৮ সনে মানবজাতির চলমান জীবনধারায় এক বিপর্যয়পূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণ এসে উপস্থিত হয়েছে। শুধু এইটুকুই নয়, উপরন্তু মানুষের জীবনের অন্তর্নিহিত বৈষম্য এবং প্রেমের নীতি যা মানুষের পক্ষে পরম আশীর্বাদস্বরূপ, এই উভয়েই আজকের দিনে এমন তীক্ষ্ণরূপ ধারণ করেছে যে, এই সবের ভেতর দিয়ে মানবজাতির পক্ষে আর আগুয়ান হওয়া সম্ভবপর নয়। এই সমস্যার সমাধান মানুষকেই করতে হবে। এই সমাধান নিশ্চয়ই অনেক আগে পরিত্যক্ত বলপ্রয়োগ নীতির দিকে ঝুঁকবে না। বরঞ্চ এই সমাধানের ঝোঁক সেই চিরন্তন সত্যের দিকেই থাকবে যা মানুষ যুগ যুগ ধরে তার বুকে সযত্নে পোষণ করে আসছে। সেই চিরন্তন সত্য, হল যে, মানব জীবনের নীতি প্রেমেরই নীতি।

এই সত্যের পূর্ণ স্বরূপে স্বীকৃতি দেওয়া মানুষের পক্ষে তখনই সম্ভব যখনই তারা ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে।

যে কোনও জাহাজকে তার ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য তার খোলকে ঝড়তি পড়তি মালে বোঝাই করতেই হয়, এটা যেমন অনিবার্য্যরূপে সত্য তেমনই সত্য—নিমগ্নমান জাহাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে এই ঝড়তি পড়তি মালগুলো জাহাজ থেকে সর্বপ্রথম ফেলে দেওয়া। ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের বেলায় ব্যাপারটা ঠিক ওই নিমজ্জমান জাহাজের মত। এই কুসংস্কারগুলো মানুষের কাছ থেকে তার প্রাণদায়িনী সত্যের মুখ ঢেকে রাখে। যাতে প্রকৃত সত্যকে মানুষে সাদরে আলিঙ্গন করতে পারে এবং যাতে এই সত্য মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ নীতি বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে তাই আমাদের করতে হবে। এই সত্য সম্বন্ধে ছেলেবেলায় যেরকম অস্পষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল কিংবা ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের কাছ থেকে যেরকম পক্ষপাত দুষ্ট, স্থিরতাবিহীন ধারণা লাভ করা হয়েছে, তাতে হবে না। রীতিমত সাহসী হতে হবে। সেই সাহসের দ্বারা তথাকথিত ধর্মীয় বা বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের হাত থেকে প্রকৃত সত্যকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা যেতে পারে। একাজ ভীরুতায় সম্ভবপর নয়। নির্ভীকভাবে সংস্কার সাধিত হয়েছিল ধর্মীয় ক্ষেত্রে, শিখ ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানকের দ্বারা এবং খ্রীষ্টীয় জগতে লুথারের দ্বারা। সংস্কার সাধন করতে তিনিই পারবেন যিনি এই সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেন।

সমস্ত কুসংস্কারমুক্ত হতে হলে মানুষকে নিম্নলিখিত সব ধারণা ও বিশ্বাস বিসর্জন দিতে হবে। যথা, মঙ্গলময় সৃষ্টিকর্তা ও দেবতাগণ, ব্রহ্মা, ইহুদী বা খৃষ্টানদের সাপ্তাহিত পুণ্যাহ, কৃষ্ণের বা খ্রীষ্টের অবতারত্ব, স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব, সুরাসুরের অস্তিত্ব, অবতারবাদ, যীশুখৃষ্টের সমাধি থেকে পুনরুত্থান এবং বিশ্বপ্রকৃতির ওপর গবেষণা-মূলক ধারণা। নির্মুক্ত মানুষ হতে গেলে মন থেকে মুছে ফেলতে হবে যে বেদ, বাইবেল, সুসমাচার, ত্রিপিটক (বৌদ্ধদের প্রামাণ্য

গ্রন্থ ইত্যাদি অভ্রান্ত এই স্বীকৃতি। আর বিসর্জন দিতে হবে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনু-পরমাণুবাদ, সুদূর মহাকাশ পারাবারে সেই বিরাট মণ্ডলীর উৎপত্তি ও গতিশীলতার মতবাদ, শক্তি সম্পর্কিত মতবাদ। আরও বিসর্জন দিতে হবে সমস্ত স্বকপোল উদভাবিত সব নীতি যেগুলো মানুষ নির্বিবাদে মেনে নিয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। যেমন, ঐতিহাসিক, অর্থ নৈতিক বা বলোত্তমের জীবনযুদ্ধে জয়লাভের মতবাদ ইত্যাদি।

মানুষের মনের এবং স্মৃতিশক্তির নিম্নতলস্থ প্রকোষ্ঠ থেকে বৃথা চর্চার ফলে যা কিছু বার হয়েছে তা সবই এক বিরাট আবর্জনাস্তূপ, যা সত্যের মুখ আড়াল করে রেখেছে। এই সমস্ত আবর্জনার মধ্যে পড়ে অগণিত বিভাগে বিভক্ত বিজ্ঞান, ইতিহাসের জাঁকজমকওয়ালা রূপের অসংখ্য বিচিত্র মানবগোষ্ঠী, (বিজ্ঞানের নানারূপ বিভাগে মানুষকে প্রাণী হিসাবে দেখে তার শারীরিক এবং মানসিক বিবর্তনের বিজ্ঞান) ধর্মপ্রচারের নানারকম পদ্ধতির বিবরণী, বীজাণুতত্ত্ব, মানবিক আইন বিষয়ের দর্শনশাস্ত্র, গ্রহনক্ষত্রাদি সমেত বিশ্বচরাচরের বিজ্ঞান সমূহ, যুদ্ধ কৌশল বিজ্ঞান ইত্যাদি। এদের নাম আরও অনেক করা যায়। কারণ এরা সংখ্যায় অগণ্য। মানুষ যদি একবার এই সমস্ত মানসিক উত্তেজনার মোদক কোষ যার পরিণতি শুধু ধ্বংসে—এই সব নিরর্থক বস্তুভারকে দূরে নিক্ষেপ করতে পারে, তা হলে শুধু তখনই মানুষের সহজ স্বভাবসিদ্ধ সেই সরল স্বপ্রকাশ প্রেম আবার তার জীবনে ফুটে উঠবে এবং সমস্ত সমস্যার জট খুলে যাবে এবং মানুষ এই প্রেমের বন্ধনকেই একমাত্র মঙ্গলময় বন্ধন বলে সাদরে মেনে নেবে।

(চ)

নিজের নির্বুদ্ধিতাবশতঃ নিজের ঘাড়ে টেনে আনা দুর্যোগ আজ তীব্রতার উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছে এবং সেই জ্বালাময়ী হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য আজ মানুষ পাগলের মত

ছোটাছুটি করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই আমরা দেখি ইংরেজ অধীনতার দাসত্ব শৃংখল ভেংগে ফেলবার জন্য হিন্দুরা আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং আরও দেখছি যে মানুষ যে কোন রকম জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। যেমন নিগ্রোরা আজ উত্তর আমেরিকা—বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগুয়ান ; যেমন পারস্যবাসীরা, রুশবাসীরা বা তুর্কীগণ তাদের শাসকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে আজ খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান। যখনই কোনও মানুষ নিজের এবং সমভাবে প্রত্যেকের মংগলের জন্য মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়িয়েছে, তখন ফেলে আসা ধর্মীয় কুসংস্কারের নতুন ব্যাখ্যা বা সমর্থনে তার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। যেমনটি বিবেকানন্দ ও বাবা ভারতীর দল করেছিল। যাবতীয় বিষয়ে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যুক্ত বিজ্ঞানভাষ্য মানুষের অনেক সময় নষ্ট করে।

হিন্দুদের যেমন ; তেমন ইংরেজদের, ফরাসীদের, জর্মনদের রুশীয়দের দেশে শাসনতান্ত্রিক নিয়মাবলীর বা বিপ্লয়ের প্রয়োজন নেই। আলোচনা বা সংসদ অধিবেশন কিংবা ডুবোজাহাজ পরিচালনার নতুন কৌশল উদ্ভাবনের, আরও শক্তিশালী বিষ্মরক আবিষ্কারের, ধনীদের উপভোগের জন্য নতুন ভোগ্যের আবিষ্কারের কোন প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য নতুন বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কোন আবশ্যকতা নেই। কারণ এতে শুধু নিরর্থক পুস্তকাবলীর ও কাগজের বৃথা খরচ শুধুই বেড়ে যায়। দরকার নেই গ্রামোফানের বা চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের দরকার নেই সেই শিশুসুলভ নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত সেই সব অসাধুতার পুঁতি গন্ধে দুষ্ট নিদর্শনগুলোর যা শিক্ষা নামে পরিচিত। মানুষের যা এখন একান্ত প্রয়োজন, তা হল সেই সরল প্রাঞ্জল 'প্রেমের নীতি' যা জীবনের একমাত্র নীতি। এই প্রেম নীতি ব্যক্তিনির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে কল্যানকর। ক্রমবর্দ্ধমান পর্বত প্রমান জড়তা থেকে যদি মনকে মুক্ত করা যায়, তবে সভ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। যে বিরাট বাঁধা

এতদিন সত্যের মুখ আবৃত করে রেখেছিল তাকে অতিক্রম করে মানুষের সেই শাশ্বত সত্য সকলের চিদাকাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। উপরন্তু এ সত্য পৃথিবীর সমস্ত ধর্মে একই রূপে স্বীকৃত হয়েছে। যখনই বেশীর ভাগ মানুষ এই চিরন্তন সত্যকে তার হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, সেই মুহূর্তেই তার জীবনের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনার অবসান ঘটবে।

['এলেটার-টু এ হিন্দু'র উত্তরে তারকনাথদাস টলস্টয়কে দ্বিতীয় চিঠি লেখেন। চিঠিটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধাকৃতি। তিনটি পর্যায়। এখানে অবশ্য প্রথম পর্যায়ের বংগানুবাদ দেওয়া হল।]

কাউণ্ট টলস্টয়ের পত্রোত্তরে—নবীন ভারত (প্রথম পর্যায়)

আমাদের ব্যক্তিগত পত্রালাপের উত্তরে আপনার হৃদ্যতাপূর্ণ পত্রে যেভাবে আপনি অহিংসা ও প্রেমের কথা আলোচনা করেছেন তাহা অতুলনীয় ও চমকপ্রদ। কিন্তু এরকমই একজন-পুণ্যাত্মার যে পুণ্যাত্মা সার্বভৌর্ম বন্ধন ও আত্মার একাত্মতা উপলব্ধি করেছেন, যে পুণ্যাত্মা কেবলমাত্র একই পরমব্রহ্মকে যাঁকে সবাই-বিভিন্ন নামকরণে ভূষিত করে থাকেন, মনগঠিত অবাস্তব তত্বে বিশ্বাসী না হয়ে সম্যক উপলব্ধি করেছেন, সে মহান ব্যক্তির কোন শাসন বিধি বা বিপ্লব বা সম্মেলনের কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর কাছে সাহিত্য বা বিজ্ঞান সবই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, জাগতিক সবকিছুই তাঁর কাছে ঘৃণ্য। জাগতিক সব গুণের উর্দ্ধের যে-অবস্থার কথা আপনি বলেছেন তাকে হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে গুণাতীর্ত অবস্থা বলে উল্লেখ করেছে।

আমাদের সাধারণ বুদ্ধি অনুযায়ী ও হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের সারবস্তু ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি বিশেষের সমাজের বা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের চারটি অবস্থায় দেখতে পাই। সেগুলি হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা, সক্রিয়তা, শান্তিও গুণাতীত অবস্থা। আমরা যেমন রামের জামা শ্যামের গায়ে লাগবে এরকম আশা করতে পারি

না তেমনি এও আশা কখনই করতে পারি না যে নিবু'দ্ধিতার অবস্থা কখনই সক্রিয়তা, শান্তি বা অন্যায়বস্থার প্রযোজিত হবে। একটি যুবকের খাদ্য প্রণালী একজন বৃদ্ধের খাদ্যপ্রণালী থেকে একেবারেই বিপরীত ধর্মী হবে। সুতরাং চিন্তাধারাও আমাদের চিন্তাধারার থোক বিভিন্নধর্মী। আপনি সবকিছু জাগতিক বস্তু পরিত্যাগ করে জাগতিক মোহের উর্দ্ধে বাস করে থাকেন। কিন্তু সেখানে যতক্ষণ আমরা এজগতে বাস করছি ততক্ষণ সবকর্তব্য সাধন করাই আমাদের উচিত।

আপনার কাছে কর্ত্তব্য বলে কিছু নেই কিন্তু আমাদের কর্তব্য আছে। আমরা হিংস্রতার পরিপূজক নই। আমাদের জীবনাদর্শ এই যে, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুধুমাত্র ন্যায্যই নয় এটা একান্ত প্রয়োজনীয়। সংগ্রাম বিরোধিতা পরার্থবাদ ও আত্মবাদ দুটিকেই আঘাত করে। মানবিক সেবা অগ্রসরতার নিয়মের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই তত্ত্বকে খুব সম্ভব আপনি বিশ্বাস করেন না। আমরা বিরোধিতা করার সমর্থক। বিরোধিতার দ্বারাই অনেক বাঁধা বিপত্তি বিনাশ করা যায়। আমরা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে মানব জীবনের বিকাশ ও শান্তি আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা কখনই হিংসার দ্বারা মানব সমাজ সৃষ্টি করার সমর্থন করব না।

আমাদের আদর্শ শুধুমাত্র একটি সম্পূর্ণ মতবাদই নয়। এটা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। সেখানে কোন আক্রমণ ও অত্যাচারের লেশমাত্র নেই সেখানে আমাদের মতবাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যতক্ষণ সুর ও অসুর বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ দুর্বলের ক্ষমতা সবলের দ্বারা গ্রাস হবে এবং মানবজীবনে নানা বিরোধিতা থাকবে- ততক্ষণ আমাদের আদর্শও বর্তমান থাকবে দৃঢ়ভাবে। যতদিন না আমাদের প্রত্যাশিত স্বর্গযুগ আসছে ততদিন মানবিক ভালবাসা সক্রিয়রূপে আমাদের এই মতবাদ বিদ্যমান থাকবে।

অহিংসা নীতি হচ্ছে একটি চরম মতবাদ। আমরা চরমনীতির

অবস্থিতি বা প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি। প্রকৃতপক্ষে অনেকের বিশ্লেষণে অহিংসানীতি বলে কিছু নেই। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শুধুমাত্র আমাদের এই বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে সংগ্রাম। এবং মহাশয়, আমরা উপলব্ধি করছি যে, আপনি আপনার কার্যকলাপ দিয়ে আমাদের মতবাদের সমর্থন করার শক্ত খুঁটি হবেন। আপনি মানবপ্রেমিক ও বিশ্ববন্ধুত্বের মহান আদর্শের শিক্ষকরূপে সংখ্যালঘুদের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাবিয়ে রাখার বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আপনি আপনার উক্তি ও লেখনীর মাধ্যমে যে বিশেষ অধিকার যাকে যদৃচ্ছ অত্যাচারীর শাসন বলব তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং সবাইকার সমান অধিকারের মহানব্রত গ্রহন করেছেন। আমার জীবনের মর্যাদাও অধিকারকে আপনি সমর্থন করেছেন। আপনি আপনার উচ্চ চারিত্রিক শক্তির দ্বারা সব কুশক্তি ও নির্মমতাকে বিনাশ করছেন।—যে নিভু'ল সত্যের সন্ধান আপনি পেয়েছেন তারই দিকে আপনি এগিয়ে চলেছেন। এইভাবেই আপনি ভুল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। যাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে আপনি সংগ্রাম চালাচ্ছেন তাদের কাছে আপনার কার্যকলাপ প্রচণ্ড হিংস্রতার পরিচায়ক। হিংসা বা অহিংসা তাদের উদ্দেশ্যের অপেক্ষিকতা দিয়ে বিচার করা হয়ে থাকে।

সম্পূর্ণ অহিংসানীতিকেই সব সময় আমরা প্রেমের পরিচায়ক বলব না। কেননা প্রায়ই এই নীতি নিষ্ক্রিয়তা ও দুর্বলতার পূর্বাভাস দিয়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত অদৃষ্ট বাদে পরিণত হয়। এই বক্তব্যের যুক্তি হিসেবে একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করছি এবং সেটা ভারতেই ঘটেছিল।

একজন হিন্দু ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ট্রেণে ভ্রমণ করছিলেন। তাদের কামরায় ওঁরা মাত্র দুজনেই ছিলেন। হঠাৎ ওঁদের কামরায় দুটি দুষ্ট প্রকৃতির লোক এসে উপস্থিত হল। তাদের মধ্যে একজন মহিলাটির পবিত্রতা নষ্ট করতে উদ্যত হল ও অন্য ব্যক্তিটি প্রবেশপথে

পাহারা দিতে লাগল যাতে বাইরের থেকে কেউ এসে ওদের এই দুষ্ট প্রক্রিয়ায় বাঁধা দিতে না পারে। পলায়নের সমস্ত পথই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মহাশয়, এই রকম পরিস্থিতিতে আপনি কি এই মহিলাটির স্বামীটিকে এই বর্বর লোকদুটির প্রতি-অহিংসানীতি অবলম্বন করে প্রেম প্রদর্শন করতে বলেন, না তার পৌরুষত্বের মর্য্যাদা স্বরূপ ঐ পাশবিক কর্মের বাঁধা দিতে বলেন? মহাশয় আপনি কি ঐ ভদ্রমহিলাটিকে এই জঘন্য কলঙ্কপূর্ণ কাজের বাঁধা দিতে বলেন না? না এটা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে এইরকম অবস্থায় সবাইকেই আপনি এইরকম ব্যবহারের বাঁধা দিতে বলবেন প্রাণপণ করে। আমাদের অবস্থাও ঠিক একই রকম। আমরা বিশ্বমৈত্রীতে বিশ্বাসী,— কিন্তু আমরা কোন সমাজ জাতি, পরিবার যে কোন একক ব্যক্তিকে স্বার্থসিদ্বির জন্যে শোষণ করাকে কিছুতেই বরদাস্ত করব না। আমরা যে সংগ্রামের সমর্থক তা নৈতিক বা নৈতিক বা বাস্তব, সক্রিয় বা নিক্রিয় অথবা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ হতে পারে। তবে আমাদের সংগ্রাম কখনই এক জাতির দ্বারা অন্যজাতির শোষণ করার নিগূঢ় প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাকৃত কার্য কলাপকে বরদাস্ত করবে না। আজ ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসকদের কবলে পড়ে নিঃশেষিত হচ্ছে। আমরা এইরূপ কর্মকে শুধু প্রকাশ্যে অভিযুক্তই করব না, একে আমরা নির্মূল করব। এটা খুবই সুখের কথা যে, আপনি আমাদের নিষ্ক্রিয় সংগ্রাম গ্রহণ করতে পরার্শ দিয়েছেন। আপনি আমাদের দেশের জনগণের কাছে— এই আবেদন জানিয়েছেন তারা যেন সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের সাহায্য না করেন। ভারতে মিলিটারী শাসনের সহায়তা না করে এবং কর সংগ্রহের ব্যাপারে বা আইনের মাধ্যমে কোন রকম হিংসাত্বক কার্য্যকলাপে অংশগ্রহণ না করে একাজটি করা যায়। আমরা আমাদের দেশবাসীর কাছে আপনার এই উত্তম উপদেশকে অনুসরণ করতে আবেদন জানাই। কেননা আমরা মনি করি নিষ্ক্রিয় সংগ্রাম প্রায়শ সক্রিয় সংগ্রামের থেকে বেশী কার্যকরী

হয়। আমরা আমাদের দেশবাসীকে একমাত্র তখনই সক্রিয় সংগ্রামের অনুগামী হতে বলব যখন তারা দেখবে যে নিষ্ক্রিয় সংগ্রাম শুধু কোনরকম সুবিচারের সুযোগ না দিয়ে কারাবণ বা নির্বাসনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যা নাকি আজ ভারতে হচ্ছে। আমরা শুধু যেখানে নিষ্ক্রিয় সংগ্রাম ব্যর্থ হবে সেখানেই শত্রুর আক্রমণ ও স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে সক্রিয় সংগ্রামের অনুগামী হতে পরামর্শ দেব।

আমরা এক প্রেমের সাম্রাজ্যের অবতারণা বা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কীভাবে এটা সম্ভব? মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই স্বতঃসিদ্ধ এই সত্যটি স্বীকার করবেন যে—ছুটো জিনিষ একই সময়ে একটি স্থানকে অধিকার করে থাকতে পারে না এবং এটা ঠিক তেমনিভাবেই সবকিছু ঘটনা ও ধারণার বেলাতেও প্রযোজ্য। বর্তমান—অবস্থার থেকে উন্নততর অবস্থার প্রবর্তন করতে হলে সব চাইতে আগে দরকার অবাঞ্ছিত রীতিনীতি অবসান করা। ন্যায়পরায়নতার উন্নয়ন সাধন করতে হলে আমরা আগে ছুষ্টের দমন করাই পরামর্শ দেব।

আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতীয়রা এবং আপনি এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে দ্বিমত নন যে, ব্রিটিশ শাসকরা ভারতবর্ষে এসে কেবলমাত্র সামান্য অর্থ সংগ্রহের জন্যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জীবনরক্ত শোষণ করে নানা ব্যবসায়িক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা সূক্ষাতিসূক্ষ বিবরণের মধ্যে না গিয়ে 'ইস্যু অফ জাসটিস' ফেব্রুয়ারী ২৭,১৯০৯, থেকে একটি মাত্র অংশ তুলে ধরছি—আমাদের উক্তির প্রমাণ স্বরূপ:—

"ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন হচ্ছে অন্যায় এ লুণ্ঠন অপহরণের এক বিস্তৃত ইতিহাস। আজ ভারতবাসীদের রক্তশুষে নেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ বলপ্রয়োগে তাদের খুব সহজেই মহামারীর শিকার হতে হচ্ছে। ভারতীয়দের নিজেদের দেশের পরিচালনা—থেকে সবরকম ভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বাক স্বাধীনতা, স্বাধীন সুবিচার এবং

সর্বপ্রকার স্বাধীনতা থেকে তাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছে। সম্পূর্ণ নিরপরাধীদের নির্বাসনে পাঠান হচ্ছে আর তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার্থে কোনরকম কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কারারুদ্ধ করা হচ্ছে। সামান্যতম রাজনীতিক অপরাধে জনসাধারণের চোখের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুন ছাত্রদের প্রহার করা হচ্ছে। যতক্ষণ না পিঠ থেকে রক্ত ধারা বইছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রহার করা হচ্ছে। ব্রিটিশ কারাগারে বিচারের আগে ও পরে এ ধরণের অত্যাচার খুবই প্রচলিত এবং ব্রিটিশ চাকুরীজীবিরা তা স্বীকার করেন। এই সমস্ত ঘটনাবলী থেকে স্পষ্টতই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ভারতবর্ষের মত আমাদের এই শাসনতন্ত্র অতীব "নিন্দনীয় এবং ইহা ভারতবাসী, ব্রিটেনবাসী এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষে সমভাবে অমঙ্গলকর ও অশুভ।"

উপরোক্ত উক্তির প্রমাণ স্বরূপ আমরা ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের কিছু নৈতিক, শিক্ষা সংক্রান্ত, স্বাস্থ্য ও আর্থিক ব্যাপারে পরিচালনা এবং নাগরিক অবস্থার কতকগুলো নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব প্রকাশ করছি। মে, ১৯০৯ সালের The Harp of Newyork এর একটি লেখা যার নাম Success of British Government in India from the Moral Point of Viewথেকে নীচের অংশটি উল্লেখ করছি। এর থেকে ইংরেজ সৈনিকদের কলঙ্ক প্রকাশ পাচ্ছে :—

ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে মেয়েদের শুধু একটা দিক বিচার করে নেওয়া হয় যে তারা সুন্দরী হবে, আকর্ষণীয় হবে। ১৮৮৬র ১৭ই জুনে স্যার, (এখন লর্ড) এফ রবার্টস জেলাস্থ ও বিভাগীয় কম্যাণ্ডিং অফিসারদের উদ্দেশ্যে এক বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেন। এতে তিনি বলেন যে, "সৈন্যদলের মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় মেয়েদের থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এবং তারা যেন আর্কষণীয় হয় ও তাদের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এই নির্দেশের প্রমাণ হিসেবে জলন্ধরের কনোট রেঞ্জের কম্যাণ্ডিং অফিসার তাহার অধস্তন কর্মচারীকে যে চিঠি লিখেছিল তা এইরূপ :

"ক্যান্টনমেন্টের ম্যাজিষ্ট্রেটকে একাধিকবার অনুরোধ করা হয়েছিল যাতে—তিনি একদল সুন্দরী ও আকর্ষণীয় যুবতী মেয়ে জোগাড় করেন—কিন্তু এ অনুরোধ—তিনি একেবারেই সফল করতে পারেন নি। তাকে আবার আবেদন জানান হচ্ছে। স্থানীয় শাসনতন্ত্রের সাহায্যে কম্যাণ্ডিং মেজর জেনারেল যেন ক্যান্টমেন্ট—ম্যাজিষ্ট্রেটকে (যাদের তিনি এ কাজে নিয়োগ করেছেন) নির্দেশ দেন উপযুক্ত সংখ্যায় অল্প বয়স্ক সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী মেয়ে সংগ্রহ করতে।"

এটা লক্ষণীয় যে সৈন্যদলের অফিসারদের প্ররোচনায় এই ম্যাজিষ্টেটরা সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করত। যখন ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ভারতে আফিং এরব্যবসা চালু করল আরতারা যে সব রাজ্য আফিম গাছের চাষের উপযুক্ত সেখানে—কমিশনার পাঠাল, এবং সমস্ত চাষীদের একত্রে ডেকে এইসমস্ত কমিশনাররা তাদের থেকে জোর করে যতখানি জমি ইচ্ছে এই জঘন্যতম ওষধির ফলনের জন্যে দিতে বাধ্য করতে লাগল।

যেসব স্থানীয় অধিবাসীরা আফিং কিনত বা যারা আফিং খেত না সরকার প্রচুর অর্থব্যয়ে বিনামূল্যে আফিং বিতরণ করে তাদের মধ্যে আফিং এর নেশা বিস্তার করতে সুরু করল। এই ঔষধি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নষ্ট করেছে, কিন্তু তাতে ব্রিটিশ সরকারের প্রচুর অর্থাগম হয়েছে।

আফিং চাষের ফল শুধু দুর্নীতি পরায়ণ নয়, এটা ধ্বংসকারীও। এটা দেশকে জনশূন্য করেছে এবং জনসাধারণকে অধঃপাতে নিয়ে গেছে। একদা যে অসমীয়ারা সুন্দর চমৎকার পৌরুষযুক্ত সাহসী জাতি ছিল তারা আজ নিতান্তই হীন ও অকেজো হয়ে পড়েছে সমস্ত ভারতের মধ্যে। তাদের জনসংখ্যার একটা হিসেব নিকেশ করা হয়েছে। ছেলেরা অকালেই বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবং মেয়েরা খুব কম সংখ্যক সন্তানধারণ করছে এবং শিশুদের মধ্যে দীর্ঘজীবন কমে গেছে। এর থেকে বেশী আর সত্যি কি হতে পারে। ব্রিটিশ ব্যাবসায়ীরা ও

ব্রিটিশ সরকারই হচ্ছে হিন্দুস্থানে আফিং ও মদ্যপান প্রচলনের উদ্যোক্তা। কয়েকবছর আগেও মদ্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। আজও ব্রিটিশ সরকার স্থানীয় সামরিক বাহিনীতে নিয়মিতভাবে মদ্যপানীয় সরবরাহ করে থাকে এবং এর একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সাহস ও পৌরষ ধ্বংস করে দেওয়া। জনসাধারণের মধ্যেও আফিং গোপনে বিতরণ করা হত এবং চীন ও ফরমোজাতে যেমন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী পরিকল্পনা নিয়েছে ভারতে ব্রিটিশ সরকার ঐ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কীভাবে আফিং ফরমোজাতে প্রচলন করা হয়েছিল তা জাপান সরকারের নথিপত্রে পাওয়া যায়।

"আফিং সর্বপ্রথম ফরমোজায় আমদানী করা হয়েছিল ৩০ বছর আগে এবং সেটা অশোধিত অবস্থায় আমদানী করা হয়েছিল। হংকং এর মধ্য দিয়ে আগে এই আফিং আনা হত আর ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা স্থানীয় অধিবাসীদের এই এই বলে বোঝাত যে ওষুধের মত গ্রহণ করলে তাদের অসুস্থতা দূর হয়ে যাবে। এতে স্থানীয় অধিবাসীরা খুবই আনন্দিত হত। এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাগনা তারা আফিং পেতে আরম্ভ করল এবং প্রথম প্রথম তাদের অসুস্থতা দুরীকরণে কিছু সাহায্যও হত বলে মনে হয়। এভাবেই তারা ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের মতে তারা আফিংকে চমৎকার ঔষধ হিসেবে ভাবতে লাগল। তখন থেকেই বেশী পরিমাণে আফিং গ্রহণ করতে লাগল। এর অনেক বছর বাদে তারা বুঝতে বা জানতে পারল যে আফিং একটি বিষাক্ত ও জঘন্য ওষধি।"

১৯০৮ সালে আগষ্টের 'ফ্রি হিন্দুস্থানে সাবধানী লেখক লিখছেন যে,

আমরা ভ্যাঙ্কুবারে দেখেছি যে, কমপক্ষে দু'শ শিখ এমনকি চায়ের সঙ্গেও আফিং গ্রহণ করছে এবং তারা খুব জোরের সঙ্গেই বলেছিল যে তাদের বলা হয়েছিল—আফিং হচ্ছে মাথা ধরা, বাত, পেটের গোলমালে অব্যর্থ ওষুধ এবং সেভাবেই তারা আফিং খেতে

আরম্ভ করে। এখন তারা এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত জিনিষটির কেনা গোলাম হয়ে পড়েছে। ভারতে মাদকদ্রব্য জনসাধারণের মাঝে প্রয়োগ করা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের একটি সমাচার তুলে ধরছি :—

২৭শে এপ্রিলে ইংরেজ 'হাউস অব কমনস' এ ভারতে কয়েকবছর ধরে শুল্ক ধার্যকারী, মদ্যপানীয় ও ঔষধি থেকে মোট কত রাজস্ব আদায় হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ বুকাননের পক্ষ থেকে মিঃ হবহাউস যে তথ্য পেশ করেছেন তা এইরূপ : এক পাউণ্ড ১৫ টাকা হিসেবে ধরে যে মোট রাজস্ব ষ্টার্লিং এ আদায় হয়েছে তা নীচে দেওয়া হল।

১৮৭৪ – ৭৫ = ১৫৬১,০০ টাকা
১৮৮৩ ৮৪ = ২৫৩৪,০০ ,,
১৮৯৪ – ৯৫ = ৩৬২০,০০ ,,
১৯০৪ ০৫ = ৫২৯৫,০০ ,,
১৯০৫ – ০৬ = ৫৬২১,০০০ ,,
১৯০৭ – ০৮ = ৫১৬৩,০০০ ,,
১৯০৮ - ০৯ = ৭৩৪২,০০০ ,,
১৯০৯ – ১০ = ৬৭১৭,০০০ ,,

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের দুই ঋষি

ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন ভাষা দুই মনীষীর বয়সেও কত পার্থক্য কিন্তু এই শতাব্দীর সূচনায় মিলিত হয়েছিলেন পরিণত টলস্টয় ও তরুণ গান্ধী। এই মিলন দৈহিক সাক্ষাৎকার নয় বরং বলা চলে ঋষি টলস্টয় ও সন্ত গান্ধীজীর হৃদয়ের মিলন। উভয়ের চিন্তা ও আদর্শের দেওয়া নেওয়া সর্বোপরি এই দুই মনস্বিতার একাত্মতা। ১৯০৯, ১লা অকটোবর, ইয়াসনায়া পলিয়ানা রুশ দেশের শান্তরসাস্পদ তপোবনে গুরুর আসনে বসে আছেন সাধক লিও টলস্টয় আর তখন সুদূর আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে ট্রান্সভ্যালে নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সত্যাগ্রহী গান্ধীজী। পথের ঠিকানা চেয়ে কাতর প্রার্থনা জানালেন পত্র মাধ্যমে। সংগে সংগে টলস্টয়ের পত্রোত্তর পেলেন। পৃথিবীর দুই প্রান্তে অবস্থিত স্থিতধী দুই মনীষার মাঝে সেতু বন্ধন রচিত হল। কিন্তু পত্রালাপের বহু পূর্বেই তরুণ গান্ধীর হৃদয় মন জয় করে নিয়ে ছিলেন ঋষি টলস্টয়।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে টলস্টয়ের জন্ম, গান্ধীজীর জন্ম ১৮৬৯। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে টলস্টয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও মহৎ চিন্তাবিদের আসনে সর্বজন স্বীকৃত আর গান্ধীজী বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যুগনায়ক, জাতির নেতা, নিয়ামক যিনি সমকালে দেশবাসীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, দেশগড়ে তুলেছেন। কিন্তু সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, ঈশ্বরবোধ ও মানুষের শ্রমে বিশ্বাস উভয়কে একত্রিত করেছিল। খুবই বিস্ময়ের বিষয় যে গান্ধীজী ছাত্রাবস্থা থেকেই টলস্টয়ের আদর্শের প্রতি অনুরাগী। আইফেল টাওয়ার দেখে গান্ধীজীর যে মন্তব্য সেটিই টলস্টর ও গান্ধীর আত্মিক মিলনের সর্বপ্রথম সূত্র বলা চলে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসে একটা বিরাট শিল্প-প্রদর্শনী হয়। সে সম্পর্কে গান্ধীজী আত্মকথায় বলেছেন "প্রদর্শনীটি খুব প্রকাণ্ড ও বিচিত্র। আইফেল

টাওয়ার মোটামুটি মনে আছে। আইফেল টাওয়ার সম্পর্কে একটা কথা বলিতে হইবে। আজ ইহা কি কাজে লাগে তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু তখন ইহার নিন্দাও শুনিয়াছি, প্রশংসাও শুনিয়াছি বিস্তর। নিন্দাকারীদের মধ্যে টলস্টয় প্রধান ছিলেন মনে পড়ে। তিনি বলিতেন যে আইফেল টাওয়ার মানুষে বুদ্ধির নয়, বুদ্ধিহীনতার স্মৃতিস্তম্ভ।" তখনও টলস্টয়ের 'হোয়াট ইজ আরট' প্রকাশিত হয়নি। (১৮৯৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়) কিন্তু শিল্প সম্পর্কে টলস্টয়ের যে মতবাদটি ডঃ পি, এস আলেফিসয়েভের 'ড্রাংকেননেস'র ভূমিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল গান্ধীজী অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সেটি পাঠ করেছিলেন এবং সময়মত উল্লেখও করেছেন ঐ শিল্প প্রদর্শনী প্রসংগে। "তাঁহার (টলস্টয়ের) যুক্তি ছিল, তামাক হইল মাদক-দ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ, কারণ যে ব্যক্তি তামাকের দাস সে যে সমস্ত পাপ কার্য করিতে যাইবে, একজন মদ্যপ কখনও তাহা করিতে সাহস করিবে না। মদ মানুষকে পাগল করে, কিন্তু তামাক তাহার বুদ্ধিকে ঘোলাটে করিয়া দেয়, তাহাকে দিয়া আকাশ কুসুম রচনা করায়। আইফেল টাওয়ার হইল এরূপ প্রভাবগ্রস্ত মানুষের অন্যতম কীর্তি। আইফেল টাওয়ায়ের চারিদিকে কোন শিল্প নাই, প্রদর্শনীর প্রকৃত সৌন্দর্যের দিকে ইহা কোনও কিছু দান করিয়াছে তাহা কোন ক্রমেই বলা যায় না।"—আত্মকথা।

লণ্ডনে গান্ধীজী—যখন ছাত্র তখনই (১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই) টলস্টয় তাঁকে আকর্ষিত করেছিলেন। আরও এক মনীষী রাস্কিনেরর প্রভাবও এই সময় লক্ষ্য করা যায়। গান্ধীজীর জীবনীকার রেভারেণ্ড ডোক তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন যে গান্ধীজী টলস্টয়ের প্রায় সমগ্র রচনাবলীই পাঠ করেছিলেন। গান্ধীজী নিজে দুটি গ্রন্থের কথা স্বীকার করেছেন—একটি টলস্টয় রচিত ভগবানের রাজ্য তোমার অন্তরে (The Kingdom of God is with'n you) অপরটি রাস্কিনের 'আন টু দিস্‌লাস্ট। (Unto this last) তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম

খণ্ডে তিনি জানিয়েছেন—আমার জীবনের উপর গভীর ছাপ আধুনিক জগতে তিনজন অংকিত করিয়াছেন—রায়চন্দ ভাই তাঁহার জীবন্ত সংসর্গ দ্বারা, টলস্টয় তাঁহার ভগবানের রাজ্য তোমার অন্তরে (The Kingdom of God is within you) নামক পুস্তক দ্বারা ও রাস্কিন 'আন টু দিস লাস্ট' নামে পুস্তক দ্বারা আমাকে চমৎকৃত করিয়াছেন।" এই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি জানিয়েছেন টলস্টয়ের পুস্তকটি তাঁকে কত গভীর ভাবে অভিভুত ও প্রভাবিত করেছিল। "আমি যখন অবিশ্বাস ও সংশয়ের নিতান্ত আকুল অবস্থায় দিন কাটাইতেছিলাম, তখন আমার হাতে আসিল—টলস্টয়ের The Kingdom of God is within you বইখানা। আমি বইটির দ্বারা গভীরভাবে অভিভুত হইলাম। আমি তখন হিংসার পথে বিশ্বাসী। বইটি পড়িয়া আমার সে বিশ্বাস দূর হইল, আমি অহিংসায় দৃঢ় বিশ্বাসী হইলাম"—(এটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা—এর বহু পরে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাস্কিনের 'আন টু দিস লাস্ট' গ্রন্থখানি তাঁহার হাতে আসে। 'দি ক্রিটিক' পত্রিকার সেই সময়কার সহ-সম্পাদক মিঃ পোলোক তাঁকে এই গ্রন্থটি পড়তে দেন। এই গ্রন্থটি গান্ধীজী গুজরাটী ভাষায় 'সর্বোদয়' নামে অনুবাদ করেন।) টলস্টয় স্বাধীন চিন্তাধারা ও গভীর নীতিবোধ ও সত্যবোধ পঁচিশ বছরের যুবককে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছিল। টলস্টয় তখন ছেষট্টি বছরের প্রৌঢ়। তিনি প্রকাশ করলেন খ্রীষ্টধর্ম ও স্বদেশভক্তি' (Christianity and Patiotism) (খ্রীঃ ১৮৯৪) গান্ধীজী এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করে ধর্মচেতনায় নতুন আলোক পেলেন। যুদ্ধ ও শান্তি (War and Peace) (১৮৬৪ খ্রীঃ—১৮৬৯ খ্রীঃ) রচনার বহু আগেই দুটি গল্পে আক্রমণে'। (The Raid) ও 'সিভাস্তোপোলে' টলস্টয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। যীশুর বাণী "পাপকে প্রতিরোধ কর না" তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি নির্ভয়ে বললেন—'চার্চ ফিরে নাও, গতানুগতিক প্রথাগত ধর্ম ফিয়ে নাও। ভগবান প্রথার মধ্যে নেই ; আছেন মঙ্গলবোধে, সত্যবোধে, বিবেকের

বাণীই ঈশ্বরের বাণী। কাউকে প্রতিরোধ করবে না। কারও প্রতি হিংস্র হবে না।' অর্থাৎ যুদ্ধ নয়, আক্রমণ নয়; প্রতিবিরোধ নয়। হিংসা নয়; অহিংসা ও সত্যাগ্রহ একমাত্র পথ। ত্রিকালজ্ঞ সত্যদ্রষ্টা ঋষি টলস্টয়। তিনি বুঝেছিলেন যুদ্ধের বিভীষিকা। সাবধান বাণী উচ্চারণও করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ছিলেন। সমস্ত বিশ্ব মেতে উঠেছিল আত্মক্ষয়ী যুদ্ধে প্রথম মহাযুদ্ধ ১৯১৪ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর চার বছর পর। বিশ্ব বধির হতে পারে, কিন্তু যোগ্য শিষ্য গান্ধীজীর জীবনবেদে অহিংসা মন্ত্রটি গাঁথা হয়ে গেল। রাজনীতিতেও তিনি এই অহিংসা মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। অহিংস সংগ্রাম বা অসহযোগ আন্দোলন—গান্ধীজীর কর্মজীবনে সম্পূর্ণ এক নতুন দর্শনের সাফল্যমণ্ডিত প্রয়োগ। যুদ্ধ সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামতের কিছু অংশ অহিংসা ও সত্য ছাড়া আমাদের কারোরই বাঁচবার আর কোনো পথ নেই। আমি জানি যুদ্ধ অন্যায় এবং পাপ। আমি এও জানি যে যুদ্ধকে বিদায় দিতেই হবে। আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসও পোষণ করি যে, রক্তপাত ও প্রবঞ্চণার মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা, স্বাধীনতা নয়।…… হিংসা নয়, অসত্য নয়, অহিংসা ও সত্যই আমাদের সত্তার নিয়ম।" (ইয়ং ইণ্ডিয়াতে প্রকাশিত ১৩-৯-১৯২৮) গান্ধীজী লিখিত 'যুদ্ধ সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি' থেকে) অবশ্য গান্ধীজীর মধ্যে অহিংসা সত্যাগ্রহের বীজ আগেই রোপিত হয়েছিল। সর্বপ্রথম তাঁর বাল্য-কালে একটি গুজরাটী কবিতা তাঁর মনে এই ভাবটি জাগিয়ে তোলে। কবিতাটির অর্থ হল—কোন মানুষ যদি তোমাকে পানীয় দেয় এবং প্রতিদানে তুমিও তাকে পানীয় দিতে পার। এটি সামান্য ঘটনা কিন্তু আসল সৌন্দর্য দেখা দেবে তখন যখন তুমি মন্দের প্রতিদানে ভাল করতে পারবে।—এরপর গান্ধীজী পড়লেন যীশুখ্রীষ্টের সারমন অন দি মাউণ্ট। গীতা ও টলস্টয়ের 'ভগবানের রাজ্য তোমার অন্তরে' গ্রন্থ দুটির প্রভাবে গান্ধীজীর অন্তরে অহিংসার ভাবটি প্রচণ্ডভাবে স্থায়ী আসন লাভ করল।

এই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় আর এক মনীষী রোঁমা রোঁলার মন্তব্যটি স্মরণ করা চলে। "কোনো ইংরেজ মিশনারি যখন তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, কি কি বই তাঁকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে—তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'দি নিউ টেস্টামেণ্ট' যীশুর বাণী উদ্ধৃত করেই তিনি তাঁর গ্রন্থ 'এথিক্যাল রিলিজিয়ন' শেষ করেন তাছাড়া ইউরোপীয়দের মনে রাখতে হবে এই এশিয়াবাসী মানুষটি টলস্টয়ে শিক্ষায় পুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি রাসকিন ও প্লেটোর অনুবাদ করেছিলেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে টলস্টয় অশীতি বর্ষে পদার্পন করেন। গান্ধীজী তাঁর অশীতি বর্ষের জন্মোৎসবে উপহার সাজালেন জোহান্সবার্গের কাছে একটি ছোট্ট পল্লীতে টলস্টয় ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে। ১৯০৮ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরে অনেক মহৎ ব্যক্তিদের কাছ থেকে টলস্টয় জন্মদিনের শুভবার্ত্তা পান —তাদের মধ্যে আছেন রোঁমারোঁলা, বার্ণাডশ, মাসারিক আর আছেন গান্ধীজী। দক্ষিন আফ্রিকায় সর্বপ্রথম ফিনিকস কলোনি নামে আশ্রম খুলে ছিলেন গান্ধীজী ফিনিকেস 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' ছাপান হত ও কিছু চাষ বাস হত। কিন্তু এই আশ্রমটি জোহান্স—বার্গ থেকে তিনশত মাইল অর্থাৎ ত্রিশ ঘণ্টার দূরত্বের অবস্থিত ছিল বলে গান্ধীজী নিপীড়িত সত্যাগ্রহীদের জন্য জোহান্সবার্গের কাছাকাছি একটি স্থান খুঁজছিলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪০শে মে রেভারেণ্ড কালেন বাক জোহান্সবার্গের কাছে ৩৩০০ বিঘার খামার বাড়ি কিনে দান করলেন। এইখানেই গান্ধীজী টলস্টয় ফার্মের ভিত্তি স্থাপন করলেন। সে জমিতে প্রায় হাজার খানেক ফলের গাছ ছিল ও ছোট একটি পাহাড়ের পাদদেশে পাঁচসাত জন লোক থাকিবার উপযুক্ত ছোট একটি বাড়ি ছিল। দুটো কুয়ো ও একটি ঝর্ণা থেকে জল সরবরাহ করা হত। এই ফার্মটি জোহান্সবার্গ থেকে ২১ মাইল দূরে ছিল। খামার বাড়ীতে ফলের বাগান ছিল। আর এই বাগানের প্রতিটি গাছে ফলের প্রাচুর্য ছিল। কমলা, এপ্রিকট ও

কুল ইত্যাদি ফল পেট ভরে খেয়েও উদ্বৃত্ত হত এই ফার্মে সকল কাজই আশ্রম বাসীদের করতে হত। গান্ধীজী নিজেও সব কাজে যোগ দিতেন। বাড়ির কাজ, ঘর বাঁধার কাজ, ছুতোরের কাজ, মুচির কাজ সবই তাঁরা নিজের হাতে করতেন।

গান্ধীজী আত্মকথায় জানিয়েছেন—"এই শ্রম একটা বলকারী ঔষুধের মত।" প্রকৃত পক্ষে "টলস্টয় ফার্মটি পুরোপুরি টলস্টয়ের আদর্শে গঠিত তা বলাই বাহুল্য।—টলস্টয়ের পূর্ণ আত্মীয়তা ও চাষ চাষীর সংগে। ইয়াসনায় পলিয়ানার প্রাকৃতিক পরিবেশ বারবার তাঁকে হাতছানি দিয়েছে।—তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন—প্রকৃতির মাঝে। কৃষকদের উন্নয়ন ও শিক্ষায় তাঁর উৎসাহ। শিল্প উন্নতির বিরোধী তাঁর মতাদর্শ। বরং কৃষক ও জমিদার উভয়ই শ্রমে অংশীদার হয়ে তৈরী করবে নিজের খাদ্য বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রা। গান্ধীজীর টলস্টয় সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে পাই—কোন কিছু বিশ্বাস করলে সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করাই ছিল টলস্টয়ের ধর্ম। সারা জীবন বিলাসের ক্রোড়ে কাটিয়ে জীবন সন্ধ্যায় তিনি কঠোর পরিশ্রমের জীবন বরণ করেছিলেন। জুতো তৈরী, কৃষির কাজ শিখে দৈনিক আট ঘণ্টা সমানে কাজ করতেন।"

পরবর্তী কালে গান্ধীজী বলেছেন স্পষ্টতই—"বিনা পরিশ্রমে যিনি নিজের অন্নবস্ত্রের অভাব মোচন করেন, তিনি অন্যকে, নিজের দেশের লোককে, শোষণ করে বেঁচে থাকেন।—ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পরিশ্রমের দ্বারা তার অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করবার জন্য। যে শ্রম না ক'রে আহার করে তার চুরি করা হয়।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৩।১০।২১)—শ্রমের প্রতি গান্ধীজীর শ্রদ্ধা টলস্টয় ফার্মের ক্রিয়াপদ্ধতি থেকেই বোঝা যায়। এই শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছিল টলস্টয়ের প্রভাবে। আমার স্বীকারোক্তিতে টলস্টয় বলেছেন—"আমরা সকলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পৃথিবীতে এসেছি। ঈশ্বরের বাণী ও তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হলে মানুষকে জীবনের সকল

ভোগ আরাম ত্যাগ করতে হবে—কায়িক শ্রম করতে হবে ,বিজয়ী হতে হবে ধৈর্য শিখতে হবে—প্রত্যেক মানুষের প্রতি করুণায় জাগ্রত হতে হবে।” কাজেই দক্ষিণ আফ্রিকায় টলস্টয় ফার্ম তৈরীর মধ্য দিয়ে টলস্টয়ের প্রতি গভীর ভক্তি ও নতি প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই আদর্শেই সংগঠিত হয়েছিল সবরমতী আশ্রম ও সেবাগ্রাম আশ্রম। গান্ধীজীর খাদির প্রতি অনুরাগ টলস্টয়ের কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে জন্মেছে।

গান্ধীজীর বিখ্যাত গ্রন্থ হিন্দ্ স্বরাজ গুজরাটি ভাষায় ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন কাগজে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এটির ইংরেজী সংস্করণ ইণ্ডিয়ান হোম রুল প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ সরকার ‘হিন্দ স্বরাজ’—গুজরাটি ভাষায় লেখা পুস্তকটির প্রচার বন্ধ করে দেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে গান্ধীজী যখন ইংলণ্ডে পাঁচমাস ছিলেন তখনই এটির ইংরেজী সংস্করণটি তৈরী করেন। হিন্দ্ স্বরাজের ইংরেজী সংস্করণটি গান্ধীজী টলস্টয়ের নিকট পাঠান এবং গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর মতামতও জানতে চান। বলা বাহুল্য টলস্টয় গ্রন্থটি পুংখানুপুংখভাবে পড়েন ও একটি চিঠিতে মতামতও জানান। গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কে তিনি আমৃত্যু আগ্রহ ও কৌতূহল দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থটিতে চরমপন্থী সম্পাদক ও নরমপন্থী পাঠকের বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী অভিনবপন্থায় স্বরাজ কী, হিন্দুস্থানের অবস্থা, সত্যকার সভ্যতা কী, ভারতবর্ষ কি ভাবে স্বাধীন হইতে পারে, সত্যাগ্রহ কী ইত্যাদি গুরুভার বিষয় আলোচনা করেছেন। টলস্টয় এই গ্রন্থটি পাঠ করে পত্রে জানিয়েছিলেন ঐ গ্রন্থে যে সমস্যা আলোচিত হয়েছে সেটি শুধু ভারতবাসীর পক্ষেই নয়, সমগ্র মানবজাতির পক্ষে মূল্যবান।

‘এ লেটার টু এ হিন্দু’ নামে প্রকাশিত পত্রটি মূলে রুশ ভাষায় লেখা ছিল। গান্ধীজী এর ইংরেজী অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। অবশ্য এই পত্রটি প্রকাশের জন্য গান্ধীজী টলস্টয়ের অনুমতি নিয়েছিলেন।

ঐ চিঠিটিকে তিনি এতই মূল্যবান মনে করেছিলেন যে রুশ ভাষায়, লিখিত এই পত্রটি শুধু ইংরেজীতে নয়, গুজরাটি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। নাতিদীর্ঘ ভূমিকা সহ গান্ধীজী ইংরেজী ও গুজরাটি ভাষায় 'এ লেটার টু এ হিন্দু' প্রকাশ করেন। এটির ভূমিকায় গান্ধীজী লিখছেন যে—

নানা জায়গা ঘুরে শেষ পর্য্যন্ত চিঠিটি এক বন্ধুর কাছ থেকে আমার হাতে এসেছে। টলস্টয়-এর অন্যান্য রচনায় আমার আগ্রহ দেখে আমার বন্ধু ঐ পত্রটি প্রকাশনার প্রস্তাব দেন। আমি সংগে সংগে রাজী হলাম। আমি গুজরাটিতে অনুবাদ করব বলে স্বীকৃত হলাম আর ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় যাতে পত্রটি প্রকাশিত হয় তার ব্যবস্থাও করতে হবে।

যে চিঠিটা আমি পেয়েছিলাম সেটি টাইপে লেখা পত্র। এই কারণেই আমি পত্র দাতার কাছে অনুমতি চাই ও সংগে সংগে তিনি আমাকে পত্রটি প্রকাশ করতে অনুমতি দেন। এই মহান শিক্ষকের অনুগত শিষ্য আমি তাঁকে আমি আমার পথ প্রদর্শক রূপে বিশিষ্ট আসনে বসিয়েছি। আজ সেই মহৎ ব্যক্তির রচিত পত্রটির প্রকাশের সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। বিশেষতঃ চিঠিটি প্রকাশের সংগে সংগে সমস্ত জগতে এটি প্রচারিত হয়ে যাবে বলে আমি গৌরবান্বিত। এটা বলা বাহুল্য যে প্রত্যেক ভারতীয়র মনে জাতীয়তা বোধ আছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতি নিয়ে আমাদের মধ্যে বহু মত বিরোধ রয়েছে।

তারমধ্যে সহিংস পদ্ধতি বহুজন স্বীকৃত ও বহুকাল থেকে চলে আসছে। স্যার কার্জন উইলির হত্যা এদের মধ্যে একটা জঘন্য ও অতিশয় ঘৃণ্য ব্যাপার। অত্যাচার দূর করবার জন্য সংস্কার সাধন করবার জন্য বলপ্রয়োগ তিনি করেন নি, বরং তার স্থলে অন্যায়ে অপ্রতিরোধের নীতিকে প্রবর্তিত করবার জন্য টলস্টয় জীবন উৎসর্গ

করেছেন। তিনি নিজে দুঃখ কষ্ট বরণ করে নিয়েছেন আর সেই দুঃখের দহনে যে প্রেম প্রকাশ পায় তার দ্বারাই তিনি বলপ্রয়োগের বিদ্বেষের সংগে মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। যে মতবাদ প্রেমের এই পবিত্র বিধিকে কেটে ছেটে সংকুচিত করতে পারে তেমন কোন ব্যতিক্রমকে তিনি কখনও স্বীকৃতি দেন নি। মানবজাতির সমস্ত সমস্যা ও অসুবিধার বিরুদ্ধে টলস্টয় এই অহিংস নীতিকে প্রয়োগ করেছেন।

পশ্চিম জগতের সর্বাপেক্ষা সুচিন্তিত লেখক টলস্টয়। একজন যোদ্ধা হিসেবে জানতেন হিংসার প্রচণ্ডতা কি। এই কারণেই তিনি জাপানকে নিন্দা করেছেন। যে জাপান অন্ধভাবে ভ্রান্ত পথে আধুনিক বিজ্ঞানকে অনুসরণ করেছে—সেই জাপানের চরম দুর্দশার দিনগুলির জন্য তিনি ভীত হয়েছেন। কাজেই আজকের এই দিনে আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে যে ইংরেজ শাসনে আমরা যখন অধৈর্য্য হয়ে পড়েছি তখন একটা অন্যায় দূর করতে গিয়ে যেন আর একটা পাপকে বাড়িয়ে না তুলি। ঘৃণ্য শিল্পোন্নতি ইউরোপ বাসীদের দাসে পরিণত করেছে মানুষের শুভ উত্তরাধিকারকে শ্বাসরোধ করে মারছে। আজ যদি ভারত আধুনিক বোমা তৈরী করে এই ভারতের পবিত্র মাটিতে নতুন সভ্যতার পত্তন করে তবে আমি বলব ভারতীয়দের আর স্বজাতি নিষ্ঠা থাকবে না। ভারতে যদি আমরা ইংরেজদের না চাই তবে আমাদের তার জন্য মূল্য দিতে হবে। টলস্টয় তার ইংগিত দিয়েছেন অন্যায়ের প্রতিরোধ করো না। তাই বলে নিজেও অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ো না। বিচারালয়ের সহিংস রীতি-নিয়ম, কর আদায়ের সহিংস পথ ও সবচেয়ে প্রধান বিষয়টি হচ্ছে যোদ্ধার হিংসাত্মক কার্যক্রম ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত হও—কেউ তোমাকে দাসত্বে আবদ্ধ করতে পারবে না। অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ইয়াসনার পলিয়ানার ঋষি একথা ঘোষনা করেছেন। নিম্নে লিখিত তাঁর বক্তব্য গুলির সত্যতা সম্পর্কে সকলেই একমত হবেন—"দুই শত কোটি লোকের বাস এমনই একটি জাতিকে একটি

বাণিজ্যিকসংস্থা দাসে পরিণত করেছে। একথা যদি সংস্কারমুক্ত কোন লোককে বলা হয় তবে সে ব্যাপারটি ঠিক বুঝতেই পারবে না। ত্রিশ হাজার মানুষ যারা ক্রীড়াবিদ নয়, বরং দুর্বল ও সাধারণ মানুষ তারা কিনা একটা জাতিকে—যারা প্রাণশক্তিতে ভরপুর তেজস্বী বুদ্ধিমান ও স্বদেশ প্রেমিক, সেই দুইশত কোটি মানুষকে দাসত্বে শৃঙ্খলিত করেছে। সংখ্যাটি দেখেই কি বোঝা যায় না যে ইংরেজরা নয়, ভারতীয়রা নিজেরাই নিজেদের দাসে পর্যবসিত করেছে।”

টলস্টয় যা বলেছেন তার পুরোটা আমরা গ্রহণ নাও করতে পারি। কোন কোন বিষয় আবার ঠিকমত বর্ণিত হয়নি। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁর অভিযোগের মূল বিষয় হল এই যে সত্য আত্মার অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে দেহের উপর কাজ করে; যে সত্য পাশবিকতার উর্দ্ধে, যে আত্মার শক্তি সর্বনাশা ক্রোধকে প্রশমিত করে তাকেই বর্তমান সভ্যতা অবহেলা করছে। অবশ্য টলস্টয় আমাদের নতুন কিছু শেখান নি। চিরন্তন এক সত্যকেই তিনি নতুন করে তুলেছেন। তাঁর যুক্তিকে খণ্ডন করা যায় না। এবং সর্বোপরি তিনি দুর্ণিবার করে যা বলেছেন কাজেও তাই করে দেখিয়েছেন। তাঁর বাণীতে সকলেরই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবে। তিনি তাঁর আদর্শে আন্তরিক ও একনিষ্ঠ। তাঁর প্রতি সকলেই মনোযোগী হয়ে উঠবে।

জোহান্সবার্গ এম, কে, গান্ধী।

১৯ই নভেম্বর ১৯০৯

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ এই সময়টা বিশ্বের ইতিহাসে এক স্মরণীয় সন্ধিক্ষণ। রুশদেশের মহান যোগী টলস্টয়ের সংগে সত্য সন্ধানী ভারতীয় যোগী গান্ধীজীর যোগাযোগ সুরু হয়। ১৯০৮ এ আশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে টলস্টয়কে গান্ধীজীর অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ, কিংবা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে টলস্টয়ের এ লেটার টু এ হিন্দু নামক

গ্রন্থটির প্রকাশ ছাড়াও সরাসরি ভাবে উভয়ের পত্র বিনিময় এই দুই বছরেই ঘটে। গান্ধীজী লণ্ডন থেকে টলস্টয়কে (তিনি তখন ইয়াসনায়া পলিয়ানায় ছিলেন) একটি চিঠি দেন ১লা অকটোবর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। টলস্টয়ের হৃদয় প্রাচ্যের দিকে উন্মুক্ত হয়েছিল ইতিপূর্বেই। তাই প্রাচ্যের চিন্তানায়ক গান্ধীজীর পত্রটি তাঁর সমুদ্র সমান হৃদয় তট আলোড়িত করে তুলল। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে, গান্ধীজীর চিঠি পাওয়ার আগে পর্যন্ত টলস্টয় তাঁর নাম পর্যন্ত জানতেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের সংগ্রাম সম্পর্কেও জানতেন না। রুশদেশীয় সংবাদপত্র এ ব্যাপারে নীরব ছিল। গান্ধীজী যে সংগ্রামীদের পক্ষ থেকে লণ্ডনে তাদের দাবী পেশ করতে গেছেন সে ব্যাপারটি টলস্টয় জানতে পারলেন গান্ধীজীর চিঠিতে সর্বপ্রথম। ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ—টলস্টয় ডায়েরির পাতায় লিখলেন—"ট্রান্সভালের একজন ভারতীয়ের কাছ থেকে একটি পত্র পেয়েছি।" এর কিছুদিন বাদে চোৎকভকে জানালেন ট্রান্সভালের এক হিন্দুর লেখা চিঠিটি আমার ভাল লেগেছে। ৮ই অকটোবর তিনি গান্ধীজীর চিঠির উত্তর দেন। গান্ধীজী ঐ বছরের ১১ই নভেম্বর লণ্ডন থেকে লিখলেন তাঁর দ্বিতীয় চিঠিটি। টলস্টয় তাঁর দ্বিতীয় চিঠির উত্তর দেননি। হয়তো তাঁর অসুস্থতার জন্য। কিন্তু গান্ধীজী সম্পর্কে সে সময় তিনি অত্যন্ত আগ্রহী। তখন অতি যত্নের সংগে তিনি পাঠ করছিলেন জোসেফ ডোকের লেখা গান্ধীজীর জীবনী। নিজের হাতে নোট করে করে তিনি বইটি পাঠ করেছিলেন—তার প্রমাণ আজও বইটিতে আছে। পরে একটি চিঠিতে জানান যে ডোকের লেখা জীবনী পড়ে গান্ধীজী ও তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত হন।

কয়েকমাস বিরতির পর গান্ধীজী ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল লিখলেন তার তৃতীয় পত্র। গান্ধীজীর প্রথম দুটি চিঠি সুদীর্ঘ। কিন্তু তৃতীয় পত্রের স্বল্প পরিসরে গান্ধীজী টলস্টয়ের প্রতি অকুণ্ঠ

অনুগতা স্বীকার করেছেন, গান্ধীজী টলস্টয়ের একজন অনুগত ভক্ততা জানিয়েছেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে টলস্টয় গান্ধীজী চিঠির উত্তর দেন এবং তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা জানান (১৯১৫ খ্রী, ১০ই আগস্ট গান্ধীজী টলস্টয়কে আর একটি চিঠিতে জানান) তাঁর প্রতিষ্ঠিত টলস্টয় ফার্মের কথা। টলস্টয় অসুস্থতার জন্য এই চিঠির উত্তর দেতে পারেন নি। তাঁর সেক্রেটারী চেৎকভ তাঁর হয়ে উত্তর দেন। ১৯১০খ্রীঃ ৭ই সেপ্টেম্বর টলস্টয়ের এই চিঠিই গান্ধীজীকে লেখা শেষ চিঠি। কারণ এর তুইমাস পরে টলস্টয়ের মৃত্যু হয়। সম্ভবত এই পত্রটিই ঋষি টলস্টয়ের সর্বশেষ রচনা। টলস্টয়ের আদেশে চেৎকভ পত্রটি রুশ ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে গান্ধীজীকে পাঠান।

চোৎকভের সাহায্যে টলস্টয় গান্ধীজীকে স্কটিশ লেখক ইসবেল মেয়োর সংগে যোগাযোগ করিয়ে দেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর চোৎকভ গান্ধীজী লিখেছিলেন—"আপনার আন্দোলন সম্পর্কে লণ্ডন অধিবাসীদের বিস্তারিত জানার আগ্রহ আছে জেনে আমার এবং টলস্টয়ের বন্ধু মিসেস মেয়োকে আপনার সংগে যোগাযোগ করার জন্য লিখলাম। লণ্ডনে আপনার বিপ্লব সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবেন। আপনার সমস্ত প্রকাশিত কাগজপত্র তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন।" গান্ধীজী লেখিকা মিসেস মেয়োর সংগে যোগাযোগ করেছিলেন—এবং এই ভদ্রমহিলার জন্যই গান্ধীজী পরিচালিত দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম ইংলণ্ড বাসীর কাছে অতি পরিচিত হল। পরে টলষ্টয়ের লেখার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের ব্যাপার নিয়ে মিসেস মেয়োর সঙ্গে গান্ধীজীর কিছুদিন পত্রালাপ হয়। এই ব্যাপারে সোফিয়া আন্দ্রেয়ভনার সংগেও গান্ধীজীর পত্রালাপ হয়। এরপর প্রায় ষোল বছর বাদে টলস্টয় এর অনুগামী চোৎকভের সংগে আবার পত্রবিনিময় হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী যুদ্ধ সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চোৎকভ

দুটি দীর্ঘ পত্রে তাঁর অভিমত জানালেন। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে গান্ধীজী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মহাত্মাজীর বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই এবং চোৎকভও তাঁকে সমালোচনা করলেন। অহিংসার পথিক যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। গান্ধীজী ১৯২৯ সালের ১৪ই জুলাই ও ২১শে জুলাই এর দুটি পত্রে চোৎকভকে আশ্বাস দিলেন—'সশস্ত্র সংগ্রামকে কোনদিনও প্রশ্রয় দেব না। যে কোন অবস্থাতেই যুদ্ধ অপরাধ।" এই চিঠি দুটিতে গান্ধীজী রুশ দেশের মহান লেখকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। টলস্টয়ের মৃত্যুর পর 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজে—২৬।১১।১০ তারিখে গান্ধীজী স্মৃতি তর্পন করেন সেটি গান্ধীজী ও টলস্টয়ের সম্পর্ক নির্নয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেটি নিম্নরূপ।

"স্বর্গত কাউন্ট লিও টলস্টয় সম্পর্কে আমরা শুধু শ্রদ্ধা সহকারেই বলতে পারি। তার কালে তিনি আমাদের কাছে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের চেয়েও বেশী কিছু ছিলেন। যতদূর সম্ভব আমরা তাঁকে যথাযথ অনুসরণ করবার প্রচেষ্টা করেছি। অনুকরণীয় প্রথায় তিনি মানবতার জন্য যে কাজ সুরু করেছিলেন তাঁর দৈহিক জীবনাবসানের সংগে সংগে শেষ তুলিকার স্পর্শ পেল। সমস্ত জগতের অসংখ্য অনুসরণকারীর মধ্যে তিনি বেঁচে আছেন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যতদিন যাবে ততই তাঁর শিক্ষা মনুষ্যজাতির মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। তিনি নিজে একজন খাঁটি খ্রীষ্টান হয়েও তিনি শুধু খ্রীষ্টধর্ম ব্যাখ্যা করেন নি—বরং তিনি জগতের সর্বধর্মের মূলে যে মূল সত্য নিহিত আছে তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। ইউরোপের আর কোনও শিক্ষাগুরু যেটা দেখাতে পারেন নি, তিনি তাই দেখালেন।—পাশবশক্তির উপর ভিত্তি করে বর্ত্তমান সভ্যতা মানুষের অন্তরের দেবত্বকেই অস্বীকার করে চলেছে। মানুষের উচিত সর্ব কর্মে পশুশক্তির পরিবর্তে প্রেমের শক্তির উদ্বোধন করা।

গান্ধীজীকে লেখা পত্রটিই টলস্টয়জীবনের সর্বশেষ রচান। ঐ পত্রে তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন। এই বিষাদের ক্ষনে ভারতীয়

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধককারীর কাছে এটাই একটা বড় সান্ত্বনা ও উৎসাহের সংবাদ যে ইয়াসনায়া পলিয়ানার ঋষি বুঝতে পেরেছিলেন ট্রান্সভালের সংগ্রাম সমস্ত পৃথিবীতে গুরুত্ব পাবে।

ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন
নভেম্বর ২৬,১৯১০

এইভাবে চিঠির সূত্রধরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই মনীষীর ভাবসেতু রচিত হয়েছিল। একজন অহিংসার পূজারী, অপরজন শান্তি ও প্রেমের দূত। তাই গান্ধী ও টলস্টয় উভয়েই আত্মার আত্মীয়তা অনুভব করেছিলেন। ছয় সাতটি ঐতিহাসিক পত্র তার সাক্ষ্য। ট্রান্সভালের চূড়ান্ত বিপদের দিনে টলস্টয়কেই গান্ধীজী স্মরণ করেছিলেন। কারণ ঐ সময়ে উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে সমস্ত বিশ্বে যে কয়েকজন মনীষী অহিংসা ও পাশবিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন তার মধ্যে নিশ্চয়ই টলস্টয়ই ছিলেন অন্যতম। রাসকিনের 'আন টু দিস লাস্টের' প্রভাবের কথা তিনি স্বীকার করেছেন। এছাড়া প্লেটো, থরো, ম্যাটসিনি, এডওয়ার্ড কার্পেন্টার সকলের শ্রেষ্ঠদানের কাছে তিনি ঋণী হলেও সর্বাপেক্ষা টলস্টয়ের নির্বিরোধ নীতি ও প্রেমের নীতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বেশী। টলস্টয়ের মতবাদের রচনাগুলি যেমন,—স্বীকারোক্তি (১৮৮০ খ্রীঃ), আমি কী বিশ্বাস করি (১৮৮৪খ্রীঃ), কি তা হলে কর্ত্তব্য, (১৮৮৬ খ্রীঃ) ভাগবত রাজ্য তোমার অন্তরে, (১৮৯৩ খ্রীঃ) শিল্প কী, (১৮৯৭ খ্রীঃ) আমাদের কালের দাসপ্রথা, (১৯০০ খ্রীঃ) আর ধর্ম কী (১৯০২ খ্রীঃ) —ইত্যাদি গ্রন্থগুলি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে। অহিংসা ও নির্বিরোধিতার মন্ত্র তিনি শুধু উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত হননি। তাঁর জীবনেও প্রকট রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতাদর্শের জন্য তিনি হয়েছিলেন সর্বত্যাগী। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারটি কাম্য বস্তুই

তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার থেকে দূরে সরে এলেন। প্রথা সর্বস্ব চার্চ্চ পরিত্যাগ করলেন। সম্পূর্ণ একাকী মহর্ষি টলস্টয় সত্যানুসন্ধান করে গেছেন। বিরাশি বছর বয়স্ক প্রধীন প্রাজ্ঞ টলস্টয় পথে প্রানত্যাগ করেন। মন্ত্র রচনা ও মন্ত্রচর্চা একই সাধনার দুটি অংগ টলস্টয় সেটাই প্রমাণ করলেন। গান্ধীজীর পত্রপাঠ করে সুদূর রুশীয় পল্লীবাসী টলস্টয় মুহূর্ত্তের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সংগে একাত্ম হলেন।—সহনাগরিকতা বোধে গান্ধীজীর অনুসৃত মত ও পথের সমর্থন করলেন।

দ্বিতীয়তঃ এই পত্রালাপের মধ্যে গান্ধীজীকৃত 'হিন্দ, স্বরাজ'। (ইংরেজী সংস্করণ) ও টলস্টয়কৃত সমালোচনা ঐতিহাসিক মর্যাদা পেল টলস্টয় গান্ধীজীর সঙ্গে মাত্র একটি বিষয়ে একমত হতে পারেন নি—সেটি পুনর্জন্মবাদ। ভগবান যীশু ও গীতার প্রতি উভয়েরই আনুগত্য থাকলেও টলস্টয় পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস করেন নি। সর্বোপরি এই পত্রগুলির মধ্যে টলস্টয় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে গান্ধীজীকেই একটি উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে টলস্টয় যে অন্তরভাবনা দ্বারা আলোড়িত হচ্ছিলেন, চিন্তার ঐশ্বর্যে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন সেই ভার থেকে মুক্ত হলেন—গান্ধীজীকে পত্রমাধ্যমে বিস্তারিত নিবেদন করে। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় খ্রীষ্ট সমাজকে নিন্দা করে বর্তমান সভ্যতার করুণ অন্তর্বিরোধটি দেখিয়েছেন লিওটলস্টয়। প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্বে বর্তমান খ্রীষ্ট সমাজ প্রতাপের ধর্মকে মেনে নিয়ে পুলিশী ব্যবস্থা, সৈন্যবাহিনী ও রাষ্ট্র গঠন করছে। কিন্তু প্রেম ও নির্বিরোধনীতিই জীবনের ধর্ম।

টলস্টয় রাষ্ট্র তত্ত্ববিদ ছিলেন না। রাজনীতি তাঁর বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তথাপি টলস্টয়কে রাজনীতির বড় শিকার হতে হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় চার্চ ও রাষ্ট্র তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল। তার কারণ চার্চ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার হিংসা নীতিকে তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। টলস্টয় মূলতঃ একজন খাঁটি খ্রীষ্টান। নিউ টেস্টামেন্টের বাণীকে

তিনি জগৎ ও জীবনে মূর্ত দেখতে চেয়েছিলেন। যীশুর প্রেমনীতিকে নিজের জীবনে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চার্চের প্রথাগত ধর্মে তিনি দেখলেন ক্ষমতার লোলুপতা, প্রেমহীনতা। রাষ্ট্র সমূহের বনিয়াদে শুধু হিংসা ও অপ্রেম। আইন ও শাসনের নামে রাষ্ট্র জনসাধারণকে উৎপীড়ন করে। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে শৃঙ্খল তৈরী হয়। প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে সামরিক শক্তি ও প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে। সেই শক্তি দুর্বলতর মানুষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। আমাদের যুগের দাসত্ব (Slavery at our time)-তে তিনি তার রাষ্ট্রচিন্তা প্রকাশ করেছেন। আমাদের যুগে প্রায় সমস্ত বিচিত্র ধরণের কাজের ব্যাপারে জনগণ নিজেদের জীবনের ব্যবস্থা নিজেরাই অনেক বেশি ভাল করতে পারে। তাদের শাসকবর্গ তাদের জন্য যে ব্যবস্থা করতে পারে নিজেরা তার চেয়ে অনেক বেশী ভালভাবে করতে পারে। শাসকবর্গের বিন্দুমাত্র সাহায্য না নিয়ে অনেক সময় শাসকবর্গের বাঁধা সত্বেও জনগণ সর্ব প্রকারের সামাজিক দায়িত্বভার সুসম্পন্ন করছে। যেমন, শ্রমিকদের সংঘ সমবায় সমিতি-সমূহ, রেলওয়ে কোম্পানি, কর্মী সমিতি ও কর্মচারী সমিতি এবং অন্যান্য সংঘ প্রভৃতি।······দীর্ঘদিনের দাসত্ব বন্ধনের দ্বারা আমরা এখন আর কল্পনাই করতে পারি না যে বলপ্রয়োগ ব্যতীত শাসনকার্য কিরূপে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু বল প্রয়োগ ব্যতীত শাসনপরিচালনা সম্ভব নয়—একথা সত্য নয়। "সামরিক সাহায্য ছাড়াও ধনসম্পত্তি রক্ষা করা চলে"। যে সব জিনিস সত্য সত্যই একজন মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন এবং যে সব জিনিস উৎপাদনকারীর নিজেরই প্রয়োজনের সেগুলি সর্বদা সমাজের রীতি প্রথা দ্বারাই রক্ষিত হয়, জনমতের দ্বারাই রক্ষিত হয়, সমাজের ন্যায়বোধের দ্বারা এবং পারস্পারিক প্রীতি বন্ধনের দ্বারাই রক্ষিত হয়। এগুলিকে বল প্রয়োগের দ্বারা রক্ষা করবার কোনও প্রয়োজন হয় না।" দুটি মৌল সত্যের উপর ভিত্তি করে টলস্টয়ের রাজনৈতিক ধারণা পল্লবিত হয়েছে। প্রথমতঃ

হচ্ছে অহিংসা দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে নৈরাজ্যবাদ ও আত্মিক স্বাধীনতা। আর বলা বাহুল্য গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তা টলস্টয়ের দ্বারা পূর্ণ প্রভাবিত। গান্ধীজী অতি তরুণ বয়সেই পরিণত টলস্টয়ের চিন্তার ফসল ঘরে তুলবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

জোহান্সবার্গে নিপীড়িত নির্যাতীত ভারতীয়দের তিনি নির্বিরোধিতার মন্ত্রে অগ্রসর হবার ও আন্দোলন করবার শিক্ষা দিয়েছিলেন। টলস্টয় 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পড়ে নির্বিরোধী ভারতীয়দের কথা জানতে পেরে খুব আনন্দিত হয়ে এই আন্দোলনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পত্র দিলেন—"নির্বিরোধিতাই প্রেমের নীতি। প্রেমের অর্থাৎ মানবাত্মার সংগে ঘনিষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষা।" 'হিন্দ্ স্বরাজ'-এর যুগ থেকেই গান্ধীজী টলস্টয়ের ভাবনায় পুষ্ট।

'হিন্দ্ স্বরাজ' পুস্তকে গান্ধীজী আধুনিক সভ্যতাকে ভয়ংকর অমংগল বলেছেন। আধুনিক সভ্যতাই ভারতের প্রধান শত্রু। ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজরা খারাপ নয়। তারা এই সভ্যতার ব্যাধিতে সংক্রামিত হয়ে পাগল হয়ে উঠেছে মাত্র। রঁ্যলা মনে করেন গান্ধীজী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে যে নিন্দা করেছেন তার মধ্যেই তাঁর উপর টলস্টয়ের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বাস্তব হয়ে উঠেছে। হিংসা ও পশুবলের প্রতি ঘৃণা, সহিংস বল প্রয়োগের আত্মাবিহীন যন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্র, স্বেচ্ছা প্রণোদিত প্রতিষ্ঠানই শ্রেয় ইত্যাদি মত সমূহের মধ্যে আদর্শ মুকুলিত হচ্ছিল সেটি পরবর্তী যুগে সর্বোদয়ের আদর্শে বিকশিত হল। প্রকৃতির দিক থেকে গান্ধীজী ধর্ম প্রবণ কিন্তু তিনি রাজনীতিতে এলেন কেন? তিনি নিজে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—"রাজনীতির নাগপাশে সকলেই আমরা এখন আবদ্ধ হয়ে গেছি যে শত চেষ্টাতেও তার কবল থেকে মুক্তির উপায় নেই। তাই আমি সেই মহাশয়ের সহিত যুদ্ধে নেমেছি।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ১২।৫।২১) রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অভূতপূর্ব। ভারতের স্বরাজ সম্পর্কে তিনি বলেছেন আত্মার শক্তির দ্বারাই স্বরাজ সম্ভব। আত্মশক্তিই

ভারতের উপযুক্ত অস্ত্র। এই অস্ত্র প্রীতির, এই শক্তি সত্যের—এর নামই সত্যাগ্রহ। ব্যক্তি স্বাধীনতার সাধনাই সত্যাগ্রহীর মূল প্রেরণা। প্রতিপক্ষকে সত্যাগ্রহীকে জয় করতে হবে ভালবাসার দ্বারা, আত্ম-সংযমের দ্বারা, দুঃখকে সানন্দে বরণের দ্বারা। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—এটি টলস্টয়েরই ধারণা—এটিই পরবর্তীকালে গান্ধীজীর আন্দোলনে অহিংসা অস্ত্র প্রয়োগের একমাত্র হাতিয়ার হল। ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে গান্ধীজী অহিংসার যে সক্রিয় রূপ কল্পনা করেছিলেন—"সক্রিয় অহিংসা বলতে বোঝায় সচেতন দুঃখ। সহজ, অন্যায়কারীর ইচ্ছার নিকট দুর্বল আত্মসর্পণ এটা নয়, পরন্তু এটা অত্যাচারীর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আত্মার সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। মানুষের জীবনে এই নিয়ম মেনে নিয়ে স্বীয় সম্মান, ধর্ম ও আত্মার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে এক অন্যায়কারীর সাম্রাজ্যের গোঠা শক্তির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করা সম্ভব। একই ভাবে সেই সাম্রাজ্যের পতন বা উত্থান ঘটানো সম্ভব।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ১১, ৮, ২০) সেই আদর্শকেই বাস্তবে সম্ভব করে তুললেন গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

টলস্টয়ের মত গান্ধীজীও নৈরাজ্য বাদী। তাঁর কাছে রাজশক্তির নিজস্ব কোন সার্থকতা নেই। ভোট দিয়ে সরকার গঠন করা অপেক্ষা পূর্ণ স্বনিয়ন্ত্রিত 'আত্মজ্ঞানী নৈরাজ্য'কে তিনি অনেক বেশী কামনা করেছেন। ঐ রাজ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে শাসন করে এবং এমন ভাবে শাসন করে যে সে প্রতিবেশীর অন্তরায় হয় না। এই জ্ঞানদীপ্ত সমাজে রাজশক্তির প্রয়োজন হয় না বলে সরকার থাকে না। যে সরকার সবচেয়ে কম শাসন করে তাকেই গান্ধীজী শ্রেষ্ঠ সরকার বলেছেন। ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁর আন্দোলন যত না সত্যি ইংরেজ শাসক হিসেবে তত তাঁর প্রতিপক্ষ। কেবল পূর্ণ অহিংসার দ্বারাই ব্যক্তিকে স্বাধীন করা যায়। অহিংসার ভিত্তিতেই শুধু সমগ্র পৃথিবীর মিলনসৌধ গড়ে তোলা সম্ভব। আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও

পশুশক্তির কোনও স্থান থাকতে পারে না। "ভারতকে ইংরাজ শাসন হইতে মুক্ত করিয়াই আমি তৃপ্ত হইব না৷ ভারতকে সকল রকম অধীনতা হইতে মুক্ত করাই আমার লক্ষ্য।" ইয়ং ইণ্ডিয়া ১২।৫।২৪।

র‍্যাঁলা গান্ধীজী সম্পর্কে বলেছেন—"রাশিয়ান টলস্টয় অপেক্ষা স্নেহকোমল এক টলস্টয়। আরও সহজে সন্তুষ্ট এক টলস্টয়। আরও স্বাভাবিক ভাবে খ্রীষ্টান এক টলস্টয়।"

গান্ধীজীর চরিত্র ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তিনি প্রচলিত ধর্মের রীতি সর্ব্বস্বতায় বিশ্বাসী নন। তাঁর ধর্মবিশ্বাস বিবেক ও বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। "আমি চতুর্বেদের বিশেষ কোনও প্রকার স্বর্গীয়তায় বিশ্বাস করি না। বাইবেল কোরান এবং জেন্দআভেস্তাকেও বেদের অনুরূপ দৈব বাণী বলে বিশ্বাস করি।" 'এথিক্যাল রিলিজিয়ন' তাঁর হিন্দু চিন্তার সঙ্গে বাইবেলের চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটেছে। 'দি নিউ টেস্টামেণ্ট' তাঁকে সব থেকে বেশী প্রভাবিত করেছিল। 'এথিক্যাল রিলিজিয়ন' গ্রন্থখানিতে যীশুর বাণী উদ্ধৃত করে শেষ করেছেন। খ্রীষ্টের প্রেম সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। যীশুখ্রীষ্টের 'সারমন অন দি মাউণ্ট' গ্রন্থখানি তাঁর খুব প্রিয় পাঠ্য ছিল। টলস্টয়েরও সকল বিশ্বাসের মূলে ছিল যীশুর প্রেম বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা। কিন্তু ঈশ্বরের ত্রিমূর্তি—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। ভগবান এক ও অদ্বিতীয়। যীশু ভগবান নন,—তিনি আদর্শ মানব। পূর্ণ মানব। যীশু শিক্ষা দিয়েছেন প্রেমধর্ম—এই প্রেম শুধু ঈশ্বর মুখী নয়, মানব প্রেমে তার পূর্ণতা। সর্বপ্রকার হিংসা দ্বেষ দূরীভূত করে ঈশ্বর ও মানবের প্রতি সমপ্রেমের সাধনাই ধর্ম। উপরন্তু চার্চের প্রথাগত ধর্ম বাহ্য আড়ম্বর ও ধাপ্পাবাজি। চার্চের ধর্মাধিপতিগণ তাঁকে ধর্মচ্যুত করলেন। মৃত্যুর পরে খ্রীষ্টান মতে তাঁর ধর্মকৃত্য প্রতিপালিত হয়নি।

টলস্টয়ের ধর্মমতের মধ্যে প্রাচ্যের চৈতন্য ও বুদ্ধের প্রভাব

আছে। গান্ধীজীও টলস্টয়ের মত বিশ্বাস করেন—যীশু মানবগুরুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি ঐতিহাসিক মানব। 'ভগবান সত্য স্বরূপ, সত্যই ভগবান, সত্যস্বরূপ ভগবান মানবার একমাত্র পথ—প্রেম বা অহিংসা।'—এই পরমবোধই উভয় মনীষীকে একসূত্রে গেঁথেছিল। গান্ধীজী ও টলস্টয়ের ঈশ্বরপ্রেম মানবমুখী। আধ্যাত্মবাদ তাঁদের অ-লৌকিক রাজ্যে নিয়ে যায়নি—বরং মর্ত্যমুখী করেছে—লৌকিক কল্যানে নিযুক্ত রেখেছে। গান্ধীজী ও টলস্টয়ের চিন্তার মিল খুঁজে পাওয়া যায় শ্রম সম্পর্কে তাঁদের মতৈক্যের মধ্যে। প্রত্যেক মানুষেরই শ্রম করা উচিৎ। কর্মের মধ্যে ঘর্ম ঝরার আনন্দে আমাদের খাদ্য বিশুদ্ধ হয়ে উঠে। যে শ্রম করে আহারের বস্তুতে তার অধিকার। ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পরিশ্রমের দ্বারা অন্নবস্ত্র সংগ্রহের জন্য। এই বিশ্বাসেই গান্ধীজী খাদির প্রচলন। করেন। শ্রমের মর্যাদা দেবার জন্য চরকার প্রচার করেন—চরকার শ্রমে প্রতিটি মানুষ নিজের রুটি জোগাড় করবে। 'ব্রেড লেবার' এর গুজরাটি প্রতিশব্দ 'জাতমেহনৎ' গান্ধীজী ব্যবহার করলেন। প্রতিটি গ্রাম অন্নে বস্ত্রে স্বাবলম্বী হবে—এই তার আশা ছিল। যাঁরা মনে করেন অন্নের জন্য শ্রম করার প্রয়োজন নেই, চরখায় সুতো কাটার প্রয়োজন নেই—তারা কিন্তু নিজের দেশের লোককে শোষণ করে বেঁচে থাকেন। শ্রমের মূল্য সম্পর্কে গান্ধীজী সচেতন হয়েছিলেন টলস্টয়ের জীবন অনুধ্যান করে—"বর্তমান কালে কায়িক শ্রম যে অবশ্য করণীয় তা প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রসংগে টলস্টয়ের জীবনের উল্লেখ করছি—একজন রুশীর বন্দারেফ তার দেশে 'রুটির জন্য শ্রমের নীতি' প্রথম প্রচার করেছিলেন,তাকে টলস্টয় কিভাবে সর্বজন বিদিত করে তুলেছেন তার প্রতিও লক্ষ্য করতে বলি।" (হরিজন পত্রিকা) রাস্কিনের 'আন্টু দিস লাস্ট' গ্রন্থটি ও টলস্টয়ের 'বোকা ইভান' —গল্পটি গান্ধীজীকে শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তিনি বোকা ইভান গল্পটি তরুন বয়সে গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ

করেন। ইভানের বোবা বোন শক্ত খেটে খাওয়া হাতে সবার আগে খাবার পরিবেশন করে। নরম হাতে খাবার পরিবেশিত হয় সবার শেষে। এই গল্পটির রূপকার্থ গান্ধীজীকে অভিভূত করে। কায়িকশ্রম করা যে ভগবানেরই আকাঙ্খিত টলস্টয় বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন—কী তা হলে কর্তব্য, আমাদের কালের দাসপ্রথা, মানুষ বাঁচে কিসে ও মানুষের কতটুকু জমি চাই ইত্যাদি নীতিবাদী প্রবন্ধ ও গল্পের মধ্য দিয়ে।

গান্ধীজীর শিল্প সম্পর্কিত মতবাদও টলস্টয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে মনে করা চলে। শিল্প কী (What is art) (১৮৯৭ খ্রী) গ্রন্থটিতে টলস্টয় চিরপ্রচলিত শিল্প ধারনার মূলে কুঠারাঘাত করলেন। শিল্প শুধু শিল্পের জন্যই নয়। তিনি সৌন্দর্য বাদকে স্বীকার করেননি শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে। বরং শিল্প পরম শ্রেয়র সঙ্গে প্রেয়র মিল ঘটাবে, তবে হবে তা সার্থক। শিল্প সাহিত্য শুধু আনন্দ সুধা নিরবধিকাল ধরে বিতরণ করবে না। তাকে হতে হবে জনকল্যাণকর, মঙ্গলকর। শিল্পের উদ্দেশ্য বিষয়কে পাঠকের গোচরীভূত করা। দুর্বোধ্যতা জটিলতা পরিত্যাগ করে বাস্তব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জাগতিক বাস্তব সত্যই সাহিত্যে শিল্পে রূপায়িত হবে। টলস্টয়ের শিল্প দৃষ্টি বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়া গ্রহণ করেছে। শিল্পীর অন্তর্নিহিত উপলব্ধ সত্যের অভিব্যক্তিই শিল্প। এটি একটি আবির্ভাব, মানবজাতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যাবে। কাজেই সামাজিক দায়িত্ব ও মানব কল্যানের আনুগত্য শিল্পীর প্রথম ও প্রধান অংগীকার।

গান্ধীজী বলেছেন মানুষের শিল্পকলার একমাত্র সার্থকতা যে, শিল্পের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে আরও বেশী করে হাজার দিকে অগ্রসর করতে পারছে। শুদ্ধ জীবন নিয়ে বাঁচাই সবচেয়ে সত্য শিল্পকলা। চিরপ্রচলিত ধারণা যে কাজের জিনিস, প্রয়োজনীয় জিনিস সুন্দর নয়, কিন্তু গান্ধীজী মনে করেন—কাজের জিনিসও

সুন্দর হতে পারে। যে কলা আত্মোপলব্ধির পথে আত্মাকে অগ্রসর করতে সাহায্য করে গান্ধীজী তাকেই সুন্দর বলেছেন। গান্ধীজী সারাজীবন ইংরেজী, হিন্দী ও মাতৃভাষা গুজরাটীতে বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন ও আলোচনা করেছেন। কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন কিন্তু সর্বত্রই তাঁর এক লক্ষ্য মনুষ্য জাতির মঙ্গল কামনা। সত্যের অনুসন্ধানে আত্মোন্মচন।

সত্য ভাষণ ও কর্মে সত্য আচরণ প্রকৃতই গান্ধীজীর জীবনের ভিত্তি। 'আমার জীবনই আমার বাণী' মহান জীবনের অধিকারী মহাত্মার পথেই সম্ভব। তাঁর সমগ্র জীবনে সত্যের সংগে পরীক্ষার নৃত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর আত্মকথায়। টলস্টয়ও তাঁর জীবনের কৃতকর্মের সত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন "আমার স্বীকৃতি" (My Confession) গ্রন্থে। উভয় মনীষীই কথায় ও কর্মে সত্যতা অর্জন করেছিলেন। টলস্টয়ের জীবনের এই নৃত ভাষনের দিকটিই গান্ধীজীর ভাল লেগেছিল। তিনি আত্মকথায় বলেছেন—"এই যুগে তিনি সর্বাপেক্ষা সত্যপরায়ণ বক্তি ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল এক অবিরাম সাধনা, সত্য সন্ধানের ও সত্য আচরণের এক অবিশ্রান্ত জোয়ার। তিনি সত্যকে কখনও গোপন করতে অথবা নিস্প্রভ করতে চান নি, পরন্তু তা পূর্ণভাবে আপোসহীন ভাবে, দ্বৈতবিহীন ভাবে কোনও পার্থিব শক্তির ভয়ে বিচলিত না হয়ে জগতের সম্মুখে ধরেছিলেন।" সত্যের জিজ্ঞাসায় টলস্টয় ও গান্ধীজী আত্মপীড়ন ও আত্মীয়পীড়নে ছিলেন সমান। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরিত্যাগ করে, নিরামিষ ভোজন করে, নিজের বস্ত্র নিজে তৈরী করে মহর্ষি টলস্টয় যে আনন্দ পেতেন তাঁর স্ত্রী সে আনন্দের অংশীদার কোনদিনও হননি। কিন্তু কস্তুরবা গান্ধী তাঁর স্বামীর পার্শ্বচরী হয়ে তপশ্চর্যার দুঃখে ও আনন্দে সমভাগী হয়েছিলেন। গান্ধীজী ও টলস্টয়ের মন্ত্রশিষ্য, কিংবা টলস্টয়ের একান্ত ভক্ত ছিলেন গান্ধীজী ইত্যাদি উক্তিগুলি অত্যুক্তি নয়। গান্ধীজী নিজেও তো স্বীকৃতি

দিয়েছেন 'আপনার একান্ত অনুকারী'। শুধু তাই নয়, টলস্টয়ের যে তিনটি গুণে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন সত্যপরায়ণতা, অহিংসা ও অন্নার্থে পরিশ্রম—সেইগুলির বিকাশ তিনি আমাদের দেশীয় যুবকদের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন—হিন্দ্ স্বরাজ গ্রন্থে তিনি ভারতীয় যুবকদের অবশ্য পাঠ্য কয়েকটি পুস্তকের তালিকা দেন তার মধ্যে শিল্প কী, কি তা হলে আমাদের কর্তব্য, স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরে টলস্টয়ের এই বইগুলি অন্যতম। টলস্টয়ের দীর্ঘ ব্যাপ্ত জীবনের প্রথমপর্ব কেটেছে আত্মদ্বন্দ্বে। এই সংঘাত বিলাসিতার ও ত্যাগের প্রবৃত্তির সংগে নিবৃত্তির। শেষ পর্বে দ্বন্দ্ব মুখর সমুদ্র—শান্ত অন্তর্লীন গভীরতায় বিরাজিত এক সর্বত্যাগী ঋষির আবির্ভাব। টলস্টয়কে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে অসংগতি থেকে সংগতি, ক্ষোভ থেকে প্রশান্তি, সংসার থেকে সন্ন্যাস ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রাপথ সমাপ্ত হয়েছে সত্য দর্শনে। টলস্টয়ের হাত থেকে গান্ধীজী সত্যের দীপ বর্তিকাটি তুলে নিলেন—যেই দীপটি ছিল অনির্বান তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকে আলোকিত করেছে—অপরকে পথের নিশানা দিয়েছে। টলস্টয়ের সাধনার অনুধ্যানে রচিত হয়েছে গান্ধীজীর জীবনবেদ। ১৯১০ এ টলস্টয়ের কাছ থেকে যে কর্মভার গান্ধীজী বহন করেছিলেন ১৯৪৭র জানুয়ারীতে তার আকস্মিক ছেদ ঘটল। অহিংসার পূজারীর বিসর্জন ঘটল হিংসার বেদীমূলে। কিন্তু ভারত তাঁর উত্তরাধিকার হারাইনি। বর্তমান প্রজন্মে ন্যস্ত এই মূল্যবান উত্তরাধিকার।

গান্ধীজীকে লেখা টলস্টয়ের প্রথমপত্র :—

ইয়াসনায়া পলিয়ানা

এম, কে, গান্ধী ৭ই অক্টোবর, ১৯০৯

ট্রান্সভাল

এইমাত্র আপনার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। ঈশ্বর ট্রান্সভালের আমাদের প্রিয় ভাইদের ও সহকর্মীদের মংগল করুন। এই সংগ্রাম সাধুতার সঙ্গে পাশবিকতার। একদিকে বিনয় ও প্রেম, অপরদিকে হিংসা ও দম্ভ। এই বিরোধিতা আমাদের এখানেও উপলব্ধ হচ্ছে, বিশেষতঃ ধর্মবিধি ও রাষ্ট্রনিয়মের মধ্যে। সামরিক বৃত্তি গ্রহণের বিরুদ্ধে যে সুচিন্তিত মতামত তারই মধ্যে এই জাতীয়-বিরোধিতা প্রায়ই প্রকাশিত হচ্ছে।

আমার চিঠি 'এলেটার টু এ হিন্দু' ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে জেনে খুব খুশী হয়েছি। 'কৃষ্ণ' নামের বইটি আপনাকে মস্কো থেকে ডাকযোগে পাঠানো হবে। পুনর্জন্ম সম্পর্কে আমার কোন মতকেই বাদ দিতে পারি না। কারণ আমার মনে হয় আত্মার অমরত্ব, পবিত্র সত্য ও প্রেম সম্পর্কে যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছে, সেটি কখনও পুনর্জন্ম বাদ দ্বারা সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভব হবে না। আপনি যদি চান, তবে আমি আপনার সংগে একটা সমঝোতায় আসতে পারি। ঐ অংশগুলিকে পরিবর্তন করে প্রশ্নের মধ্যে বক্তব্যকে রাখতে পারি। সম্পাদনার কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশী হব। আমার লেখা ইংরেজী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশের ও বিতরণের ব্যবস্থা করছেন জেনে খুবই আনন্দিত হয়েছি। রয়্যালটির টাকা পয়সার ব্যাপারটি প্রথাগত প্রতিশ্রুতির আকারে উপস্থিত করার কোন প্রয়োজন নেই।

আমার সহৃদয় ভ্রাতৃপ্রেম গ্রহণ করুন। আপনার সংগে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হয়েছি।

লিও টলস্টয়

গান্ধীজীকে লেখা টলস্টয়ের দ্বিতীয়পত্র ঃ—

১৯ মে, ১৯১০

প্রিয় বন্ধু

এইমাত্র আপনার পত্র ও 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল' বইটি পেলাম। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আপনার বইটি পড়লাম। কারণ আপনি যে প্রশ্ন বইটিতে উত্থাপন করেছেন সেটি শুধু ভারতীয়দেরই সমস্যা নয়, সেটি সমস্ত মানবজাতির সমস্যা। আমি আপনার প্রথম চিঠিটি পাইনি। কিন্তু ডকের লেখা জীবনচরিত আপনার প্রতি আমার মনোযোগ গভীরভাবে কেড়ে নিয়েছে। এই জীবনী গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আপনাকে আরও ভাল ভবে জানবার সুযোগ পেলাম।

বর্তমানে আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। সাধারণ ভাবে আপনার ক্রিয়াকলাপ ও আপনার প্রেরিত গ্রন্থটি যা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই সকল বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করার ছিল। কিন্তু এখন সে সব নিয়ে কিছু লেখা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠেই আপনাকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাব।

আপনার বন্ধু ও ভাই,

লিও টলস্টয়।

গান্ধীজীকে লেখা টলস্টয়ের তৃতীয়পত্র ঃ—

এম. কে. গান্ধী সমীপেষু,

জোহান্সবার্গ

ট্রান্সভাল, দক্ষিণ আফ্রিকা

কোটচেটি

(টলস্টয়ের ছোটমেয়ের প্রাসাদ)

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১০,

আপনার প্রেরিত পত্রিকা ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন পেয়েছি। সত্যাগ্রহ সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন তা আমাকে আনন্দ দিয়েছে।

এ প্রবন্ধগুলি পাঠ করে আমার অন্তরে যে চিন্তার আনাগোনা সেগুলি আপনাকে জানাতে ইচ্ছে হচ্ছে।

যতদিন যাচ্ছে—যদিও এখন আমি মৃত্যুপথযাত্রী—তত্ই আমার ইচ্ছে জাগছে আমার অন্তরের যে ভাবগুলি আমার সমগ্র সত্তাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছে সেই ভাবগুলি অপর সকলের কাছে প্রকাশ করে যাই। আর এই ভাবগুলি আমার মতে খুব মূল্যবান। প্রকৃতপক্ষে আমারা যাকে অপ্রতিরোধ বলি সেটা প্রেমের শৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছু নয়—প্রেমের এই বিধানকে কোন মিথ্যার দ্বারা বিকৃত করা যায় না। প্রেমাকাঙ্খা হ'ল সহৃদয় হৃদয় সংবাদ ও অপর আত্মার সঙ্গে মিলন সাধন। এবং এই জাতীয় আকাঙ্খা সর্বদাই মহৎ কাজের উৎস উন্মুক্ত করে দেয়। এই প্রেম মানুষের জীবনের মহত্তম ও অভিনব বিধি যেটা প্রতিটি মানুষ অন্তরের গভীরে অনুভব করে। শিশুর আত্মায় এটি সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত হয়। এবং যতদিন না জগতের মিথ্যা মতবাদের দ্বারা তার দৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় ততদিন সে এই সত্যকে উপলব্ধি করে।

ভারতীয়, চৈনিক, হিব্রু, গ্রীক ও রোমান সকল দেশের দার্শনিকগণ প্রেমের এই বিধানকে প্রচার করে গেছেন। সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন যীশুখ্রীষ্ট। তিনি বলেছেন প্রেমধর্মের মধ্যে নীতি ও দৈববার্তা উভয়ই বর্তমান। কিন্তু তিনি অনেক করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আইন যখন কার্যকরী হবে তখন অনেক বিকৃতি দেখা দেবে। জাগতিক স্বার্থের জন্য যে মানুষ বেঁচে থাকে সেই মানুষকে তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে এই বিকৃতিগুলো দেখিয়ে গেছেন। যখন কোন মানুষ হিংসার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে ঠিক তখনই এই বিপদটি গড়ে উঠে। অর্থাৎ কিনা যখন গায়ের জোরে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জিনিসটি পুনরায় ফিরিয়ে আনি কিংবা কিলের বদলে কিলটি ফিরিয়ে দেই, তখনই এ জাতীয় মনোভাব প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সব বিবেকবান ব্যক্তির যেমন জানা

উচিত, যীশুখ্রীষ্টও জানতেন যে হিংসা ও প্রেম যেটি হচ্ছে কিনা মানব জীবনের মৌলিক বিধান, দুটি এক সংগে কাজ করতে পারে না। তিনি জানতেন যদি কোনও একটি ক্ষেত্রে হিংসার প্রশ্রয় হয় তবে প্রেমধর্ম প্রতিদানে ব্যর্থ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রেমধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। সমগ্র খ্রীষ্ট্রীয় সভ্যতা বহিরঙ্গে এত উজ্জ্বল যে এই ভুল বোঝাবুঝি গড়ে উঠেছে এবং এই নিদারুন বিস্ময়কর বৈপরীত্য কখনও সচেতন ভাবে কখনও অসচেতন ভাবে ঘটছে।

বাস্তবে দেখা যায় যেই প্রেমের মাঝে প্রতিরোধকে স্বীকার করে নেওয়া হয় তখনই প্রেম থাকে না—অস্তিত্বের নিয়ম অনুযায়ী প্রেম থাকতেও পারে না—এটাই সর্ব শক্তিমানের ন্যায়সম্মত বিচার। ঠিক এইভাবেই উনিশ শতকের খ্রীষ্টীয় সমাজ বেচে আছে। প্রকৃতপক্ষে সমাজ গড়তে গিয়ে মানুষ সব সময়ই হিংসাকে অনুসরণ করছে। খ্রীষ্টধর্মে প্রেমের বিধান এত সুন্দর ও সুনির্দিষ্টভাবে ফুটে উটেছে যে অন্য কোন ধর্মে এভাবে কখনও প্রকাশিত হয়নি। এবং এখানেই অন্য জাতির সঙ্গে খ্রীষ্টানদের আদর্শগত পার্থক্য। খ্রীষ্টিয় জগৎ শতভাবে এই প্রেমধর্মকে মেনে নিয়েছে। আবার একই সঙ্গে হিংসাত্মক কাজের প্রয়োগকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। এবং এই হিংসাবোধের উপরই তাদের সমস্ত জীবন গড়ে উঠেছে। সেই কারণেই খ্রীষ্টান মানুষের জীবন সম্পূর্ণ বিরোধিতায় পূর্ণ—একদিকে তাদের বৃত্তি, অপরদিকে তাদের জীবনের মূল সত্য, একদিকে জীবধর্ম হিসেবে প্রেমের স্বীকৃতি, অপরদিকে জীবনের অপ্রতিরোধ্য অংগ হিসেবে হিংসাকে স্বীকৃতি—সরকার, ট্রাইব্যুনাল, সৈন্য—এদের কাজকর্মকে মেনে নেওয়া হচ্ছে ও প্রশংসা করা হচ্ছে। খ্রীষ্টজগতের ভেতরের সম্প্রসারণের সংগে সংগে এই বিরোধিতা সমসাময়িক কালে প্রচণ্ড আকার প্রাপ্ত হয়েছে।

বর্তমানে এই প্রশ্নটি স্পষ্টতই নিম্নলিখিত আকার নিচ্ছে—হয় আমাদের মেনে নিতে হবে যে আমরা ধর্ম বা জাতির শাসন মানিনা ও জীবনপথে একমাত্র বলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি কিংবা আমাদের মানতে

হবে যে বলপ্রযোগ করে যে কর আদায় করা হয় তা উঠিয়ে দিতে হবে। বিচারালয়, পুলিশী প্রতিষ্ঠান ও সর্বোপরি সৈন্যবাহিনীর অবলুপ্তি একান্ত প্রয়োজন।

এবারের বসন্তকালে মস্কোতে একটি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ধর্ম পরীক্ষা নেবার সময় একজন অধ্যাপক যিনি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা নিচ্ছিলেন ও একজন বিশপ মেয়েদের বাইবেল বর্ণিত দশটি বিধানের উপর ও সর্বোপরি ষষ্ঠ বিধানটির 'তোমাদের হনন করা উচিৎ নয়' এর উপর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন। পরীক্ষক মেয়েদের কাছ থেকে যখন সঠিক উত্তরটি পেলেন বিশপ কিছুটা থেমে তাকে আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন "হত্যাকে কি 'পবিত্র বিধানে' নীতি বহির্ভূত বলে ঘোষনা করা হয়েছে?" 'শিক্ষকের দ্বারা প্রভাবিত বিকৃতবুদ্ধির মেয়েরা উত্তর দিল, না, সর্বদা নয়, তবে যুদ্ধে হত্যা ও অপরাধীকে শাস্তি দিতে হত্যাকে মেনে নেওয়া হয়েছে। যাই হোক ওদের মধ্যে একটি মেয়েকে (আমি যা বলছি গল্প নয়, সত্য ঘটনা। আমাকে এক প্রত্যক্ষদর্শী ব্যাপারটা জানিয়েছে') ঐ একই প্রশ্ন 'হত্যা কি অপরাধ' জিজ্ঞেস করা হল। সেই বেচারা বেশ বিচলিত হয়ে পড়ল, মুখ আরক্তিম করে অপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল 'হ্যাঁ, সব সময়েই হত্যা অপরাধ'। বিশপ মহোদয় বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি অত্যান্ত দৃঢ়তার সংগে উত্তর দিল—ওল্ড টেস্টামেন্ট ও যীশুখৃষ্ট উভয়ের দ্বারা হত্যাকে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে—যীশু শুধু হত্যাকেই অপরাধ বলেন নি, প্রতিবেশীর প্রতি দুর্ব্যবহারকেও অপরাধ বলেছেন। বিশপ মহোদয় তাঁর বাকচাতুর্য্য সত্বেও ছোট মেয়েটির কাছে হার স্বীকার করলেন ও মেয়েটি জয়ী হল।

হ্যাঁ, আমরা আমাদের পত্রিকাগুলিতে বিমান চালনার উন্নতি নিয়ে, কিংবা এই ধরনের অন্য কোন আবিষ্কার নিয়ে জটিল কূট নৈতিক সম্পর্ক নিয়ে, বিভিন্ন ক্লাব ও গোষ্ঠি নিয়ে এবং তথাকথিত শিল্প সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করতে পারি আর এই ভাবে ঐ তরুনীটি যে কথা

বলল তা অনুসরণ করতে পারি। কিন্তু এসব ব্যাপারে নীরবতায় কোন কাজ হয় না, কারণ খ্রীষ্টজগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রায় একই ভাবে, হয়তো কিছুটা অস্পষ্টভাবে মেয়েটির মত অনুভব করছে। সোসালিজম, কম্যুনিজম, এনার্কিনিজম, মুক্তিবাহিনী, ক্রমবর্দ্ধমান অপরাধী কুল, বেকারত্ব ধনীদের মধ্যে অস্বাভাবিক বিলাসিতার সীমাহীন বৃদ্ধি, দরিদ্রদের বেদনাদায়ক দুঃখ, আত্মহত্যার সংখ্যার সাংঘাতিক প্রকারের বৃদ্ধি-ইত্যাদি বিষয়গুলি আমাদের অন্তর্বিরোধের লক্ষণ—এগুলি থাকতে বাধ্য। এগুলিকে পৃথক করা যায় না। এবং নিঃসন্দেহে এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে প্রেম ধর্মকে গ্রহণ করা ও হিংসাবৃত্তিকে পরিত্যাগ করা। অতঃপর বলা চলে আপনি ট্রান্সভালে যে কর্মে নিযুক্ত আছেন সেটি পৃথিবীর যে অংশে আমরা বাস করি তার থেকে সে স্থানটি বহুদূরে, কিন্তু তথাপি বলব আপনার কাজকর্ম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব ধর্মী প্রমান জুগিয়েছে যার সংগে শুধু খ্রীষ্টানরা নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোক অংশ গ্রহণ করবে।

আপনি জেনে সুখী হবেন যে আমাদের রাশিয়াতেও এই ধরনের আন্দোলন সৈন্যবাহিনীর ক্রমবর্দ্ধমান ক্রিয়াকলাপকে অস্বীকার করে গড়ে উঠেছে। আপনার ওখানকার অপ্রতিরোধ আন্দোলনকারীরা কিংবা এখানকার সৈন্যবাহিনীকে পরিত্যাগকারী রুশরা যতই সংখ্যায় কম হোক না কেন সকলেই তারা অত্যন্ত সাহসের স্পর্ধার সংগে জানাতে পারবে ভগবান আমাদের সংগে আছেন এবং ভগবান মানুষের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান।

খ্রীষ্টানগণের স্বীকারোক্তির মধ্যে এমনকি আমাদের চারপাশে বিকৃতবুদ্ধি খ্রীষ্টানগণের মধ্যে এবং ক্রমাগত সেনাবাহিনীর স্বীকৃতি দানের মধ্যে, ও মানবহত্যার ক্রমবর্দ্ধমান প্রস্তুতির মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিরোধিতা বর্তমান। এই বিরোধিতা এতই করুণ যে আগে কিংবা পরে সম্ভবতঃ খুব শিগীরিই অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশিত হতে বাধ্য। এতে হয় আমাদের খ্রীষ্টধর্ম পরিত্যাগ করে সরকারের বল প্রয়োগে

সাহায্য করতে হবে, নয়তো সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হবে। রাষ্ট্রের সহযোগিতায় যে সব হিংসাত্মক কার্য হচ্ছে সেসব পরিত্যাগ করতে হবে। ঐ বিরোধিতা ব্রিটিশ সরকার ও আমাদের রুশ সরকার সব সরকারই অনুভব করছেন—সেইজন্যই সংরক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে প্রতিপক্ষকে সমানে নির্যাতন করছেন। এ ব্যাপারটি রাশিয়াতেও দেখছি ও আপনার পত্রিকাতেও দেখতে পেলাম। মূল বিপদটি কোন দিক দিয়ে আসবে সরকার তা জানেন। সেই কারণে অত্যন্ত উৎসাহের সংগে সেই বিপদকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেন এমন বিচারের সাহায্যে যেটা তাদের শুধু স্বার্থরক্ষাই করে না বরং তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামেও সহায়ক হয়।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে,

লিও টলস্টয়

ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্যালেস হোটেল
৪ নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট
লণ্ডন, এস, ডাবলু
১লা অক্টোবর ১৯০৯

মহাশয়,

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে গত তিন বছর ধরে যা ঘটে চলেছে আপনি অনুগ্রহ করে তার দিকে নজর দিলে বাধিত হব।

ব্রিটিশ ভারতের প্রায় তের হাজার অধিবাসী ঐ উপনিবেশে বাস করছে। নানারকম আইনগত অসুবিধার জন্য এইসব ভারতীয়গণ কিছু কষ্টভোগ করে আসছেন। বর্ণ বৈষম্য ও এশীয়বাসীদের প্রতি কিরূপ মনোভাব একানে বিদ্যমান। এসীয়বাসীদের দিক থেকে বলা চলে প্রধানতঃ এটি বাণিজ্যিক কারণে ঈর্ষা। তিন বছর আগে এ ব্যাপারটি চরমে পৌঁছেছিল যখন আমরা একটি আইনকে অমানবিক

বলে গণ্য করেছিলাম। আমি মনে করি এই ধরনের আইনের কাছে আনুগত্য স্বীকার করা প্রকৃত ধর্মাচরণের সংগে অসংগতিপূর্ণ। আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু এখনও দৃঢ়ভাবে অ-প্রতিরোধ নীতিতে বিশ্বাস করি। আপনার নানা লেখা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। লেখাগুলি আমাকে প্রভাবিত করেছে গভীর ভাবে। বৃটিশ ভারতীয়গণের কাছে অবস্থাটা সম্পূর্ণভাবে বোঝান হয়েছিল। তাঁরা এই আইনের কাছে মাথা নত না করে বরং আইন অমান্য করে কারাদণ্ড বা অন্যকোন শাস্তি ভোগ করাকেই কাম্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। এর ফলে যে সব ভারতীয়রা কারা বরণ করতে অক্ষম তাঁরা এই আইনকে অপমানজনক বলে মনে করায় ট্রান্সভাল ছেড়েই চলে গেলেন। যাঁরা থেকে গেলেন তাঁদের মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার ভারতীয় বিবেকের তাড়নায় কারাবরণ করলেন। কেউ কেউ আবার পাঁচবারও জেলে গেলেন। চারদিন ছেকে ছয়মাস ছিল কারাবরণের মেয়াদ। প্রতিক্ষেত্রেই ছিল সশ্রম কারাদণ্ড। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এখন ট্রান্সভালে একশ'র বেশী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী আছেন। এদের মধ্যে অনেকেই খুব গরীব—দিন মজুর। ফলে এদের পরিবারবর্গকে সাধারণের দানে, বিশেষ করে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীদের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এতে ব্রিটিশ ভারতীয়দের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। তবে আমার মতে এটা অবশ্য খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। এখনও সংগ্রাম চলেছে—কতদিন চলবে সেটা বলা যায় না। তবে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট যেখানে পশুশক্তি ব্যর্থ সেখানে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সফল হবে। আমাদের দুর্বলতার জন্যই সংগ্রাম দীর্ঘতর হচ্ছে। এর থেকে সরকারের মনেও এই ধারণা জন্মে গেছে যে আমরা আর বেশী দিন এই রকম কষ্ট সহ্য করতে পারব না।

আমি আমার এক বন্ধুকে সংগে নিয়ে এখানে এসেছি রাজকর্তৃপক্ষের কাছে সব ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলার জন্য, যদি কিছু

প্রতিবিধান করা যায়। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীরা মনে করেন এ ব্যাপারে সরকারের কাছে অনুনয় করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই—কিন্তু দুর্বল সদস্যদের পক্ষ নিয়ে আমরা এখানে এসেছি। কাজেই এই দলটি তাদের শক্তি নয়, দুর্বলতারই প্রতিনিধিত্ব করছে। আমি ভাবছি যদি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি ও কার্যকারিতা নিয়ে যদি একটা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যেত তবে সেটা এই আন্দোলনকে অনেক বেশী জনপ্রিয় করে তুলতে পারত এবং জনসাধারণকেও ভাবিয়ে তুলতে সক্ষম হত। এই রচনা প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আমার এক বন্ধু নৈতিক প্রশ্ন তুলেছেন—এই ধরনের আমন্ত্রন নাকি সত্যিকারের প্রতিরোধ নীতির বিরোধী—এটা নাকি জনসাধারণের মতামত কিনে নেবার সামিল। ঐ নৈতিক প্রসংগে আপনার মতামত প্রকাশ করবার অনুরোধ করতে পারি কি? এবং আপনি যদি মনে করেন যে এতে কিছু অন্যায় নেই, তাহলে আপনাকে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব কয়েকজনের নাম উল্লেখ করার জন্য যাদের কাছে এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারব।

আরও একটা ব্যাপারে আপনার সময়ের উপর হস্তক্ষেপ করব। আপনার একটি চিঠি বর্তমান ভারতের অশান্তি সম্পর্কে কোনও এক হিন্দুকে লেখা চিঠিটির একটি কপি আমার এক বন্ধুর হাতে এসেছে। মোটামুটি ঐ চিঠিতে আপনার মতবাদ প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। আমার বন্ধুর ইচ্ছা যে নিজের খরচে ঐ চিঠি ছাপিয়ে সাধারণের মধ্যে বিলি করেন। এবং এই চিঠির অনুবাদ করতেও তিনি চান। কিন্তু আমরা এখনও মূল চিঠিটি জোগাড় করতে পারিনি। ঐ চিঠির একটি প্রতিলিপি এই সংগে পাঠাচ্ছি। আপনি দয়া করে আমাদের জানান যে ঐটি আপনার লেখা চিঠি কিনা, ঠিক ঠিক প্রতিলিপি করা হয়েছে কিনা এবং চিঠিটি ছাপাতে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন কিনা। আপনি যদি মনে করেন ঐ চিঠিতে আরও কিছু সংযোজন করার প্রয়োজন আছে তবে আপনি অনুগ্রহ করে তা করে দেবেন।

সাহস করে একটি প্রস্তাব রাখছি। চিঠির শেষ পর্যায়ে আপনি অবতারবাদে অবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। আমি জানি না প্রশ্নটি যথাযথভাবে আপনি অনুধাবন করেছেন কিনা। (আমার বেয়াদপি ক্ষমা করবেন) তবে ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ অবতারবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বহুদিন ধরে বিশ্বাস করে আসছেন। চীন দেশবাসীরাও বিশ্বাস করে এতে। অনেকের পক্ষেই এই বিশ্বাস জন্মেছে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। পড়াশুনার মধ্য দিয়ে ঠিক এই জিনিসটি উপলব্ধি করা যায় না। এই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে জীবন রহস্যের অনেক যুক্তি সংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ট্রান্সভালে যারা কারাবাসে কাটিয়েছেন—সেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীদের কাছে এটি সান্ত্বনার একটি পথ। ঐ মতবাদে আপনাকে বিশ্বাসী হবার জন্য আমি এসব লিখছি না। বরং আপনি পাঠকদের যে সব ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য বলেছেন তার থেকে যদি 'অবতারবাদ' কথাটি বাদ দেন—এটাই আমার উদ্দেশ্য। আলোচ্য চিঠিতে আপনি অনেক ক্ষেত্রে কৃষ্ণের উক্তি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যে বই থেকে ঐ উদ্ধৃতিগুলি নিয়েছেন সেই বইটির নাম জানালে বাধিত হব।

এই চিঠি হয়ত আপনার ক্লান্তি ঘটাবে। জানি, যাঁরা আপনাকে সম্মান করেন এবং অনুসরণ করেন তাদের আপনার সময় নষ্ট করার কোন অধিকার নেই। বরং আপনাকে বিব্রত করা থেকে বিরত থাকাই উচিত। আমি আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। যে যে সমস্যাগুলি সমাধান করা আপনি আপনার জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করেছেন, সে সম্পর্কে আপনার উপদেশ লাভের ইচ্ছায় সত্যের খাতিরে এই চিঠি লেখার স্পর্ধা করছি।

শ্রদ্ধা জানিয়ে—
আপনার অনুগত সেবক
এম. কে. গান্ধী

টলস্টয়কে লেখা গন্ধীজীর দ্বিতীয়পত্র ঃ—

ওয়েস্ট মিনিস্টার প্যালেস হোটেল
৪, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন

প্রিয় মহোদয়, ১০ই নভেম্বর, ১৯০৯

গত চিঠিতে আমি যে সব বিষয়ে অবতারণা করেছিলাম ও আপনার 'হিন্দুকে লেখা চিঠি' উভয়বিধ ব্যাপার নিয়ে আপনি যে রেজিষ্টার্ড পত্রটি পাঠিয়েছেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে।

আপনার শারীরিক অসুস্থতার জন্যে আপনাকে প্রাপ্তি সংবাদ জানান হয়নি—পাছে আপনি আবার উত্তর দিতে গিয়ে অসুবিধায় পড়েন। এ অবস্থায় চিঠি লিখে আপনাকে ভদ্রতা জানান অহেতুক ভদ্রতা দেখান হত। কিন্তু মিঃ আইল মডের (Mr. Aylmer maude) সাথে সাক্ষাৎ করে জানতে পারলাম যে আপনার শরীর সুস্থই আছে এবং প্রতিদিন সকালে নিয়মিতভাবে আপনি চিঠিপত্রের জবাব দিয়ে থাকেন।

আপনার শরীর সুস্থ আছে জেনে যে বিষয়গুলিকে আমি আপনার শিক্ষামত অত্যন্ত জরুরী মনে করি সে বিষয়ে আপনাকে লিখতে খুব আনন্দিত ও উৎসাহিত বোধ করছি। আমি যে কারণে আমার জীবন উৎসর্গ করেছি—আমার জীবনের সেই সংগ্রাম নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার এক ইংরেজ বন্ধুর লেখা একটি বই এই চিঠির সংগে পাঠাচ্ছি। ঐ বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে বইটি পাঠান হল। আশা করি অনুচিত বিবেচনা করবেন না। আমার মনে হয়, ট্রান্সভালে ভারতীয়দের সংগ্রাম আধুনিককালের একটি মহৎ ঘটনা। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে পথ এরা গ্রহণ করেছেন তা আদর্শস্বরূপ। আমি এমন কোন সংগ্রামের কথা জানি না যেখানে সংগ্রাম শেষে সংগ্রামীরা কিছু না কিছু লাভ করেছেন এবং শতকরা পঞ্চাশজন মানুষ আদর্শের প্রচণ্ড কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

আমাদের এই সংগ্রাম সম্পর্কে বেশ জাহির করে বলতে ইচ্ছে করলেও এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না। সম্ভবতঃ আপনি একালের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। মিঃ ডোকের বইটিতে আপনি যে বৃত্তান্ত পেয়েছেন তাতে যদি আপনি মনে করেন আমার গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিক তবে আমাদের এই সংগ্রামকে যে কোনভাবে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আপনার প্রভাব বিস্তার করুন—এই আমার অনুরোধ। যদি আমাদের আন্দোলন সার্থক হয়, তবে সেটা শুধু অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের জয়, ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রেমের জয়, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জয় মাত্র হবে না ; উপরন্তু লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ও বিশ্বের অনুন্নত দেশবাসীদের উন্নতি সাধনের উদাহরণ হয়ে থাকবে। এই আন্দোলন অন্ততঃপক্ষে ভারতের সহিংস দলগুলিকেই ভেংগে ফেলতে সাহায্য করবে। আমরা যাদ শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারি, আমার বিশ্বাস আমরা তা পারব, তবে আমাদের এই কাজে আপনার অনুপ্রেরণা ও প্রদর্শিত আদর্শ আমাদের সংকল্পকে সুদৃঢ় করে তুলবে।

এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল তা সবই ব্যর্থ হয়েছে এবং আমার সহকর্মীগণ এই সপ্তাহে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গিয়ে কারাবরণ করব। আমার সংগে আমার পুত্র এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। আমার ছেলে এখন ছয়মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছে। এই সংগ্রামে এটি ওর চতুর্থ বার কারাবরণ করা।

আপনি যদি কষ্ট করে এই চিঠির উত্তর দিয়ে উঠতে পারেন তবে আমার জোহান্সবার্গের ঠিকানায় চিঠি দেবেন। এসএ. বকস/৬৫২২।

আপনার শারীরিক সুস্থতা কামনা করে।

আপনার অনুগত সেবক,

এম. কে. গান্ধী।

টলস্টয়কে গান্ধীজীর লেখা তৃতীয় পত্র ঃ—

জোহান্সবার্গ,
৪ঠা এপ্রিল, ১৯১০

প্রিয়

মহাশয়,

আপনার মনে আছে কি লণ্ডন থেকে আমি আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম, তারপর কিছুদিন আর চিঠিপত্র দেইনি। আপনার অনুগত অনুকারী হিসেবে আমার লেখা একটি পুস্তক পাঠালাম। আমার গুজরাটী রচনা থেকে এটি অনুবাদ করেছি আমি। আমার মূলগ্রন্থটি ভারত সরকার বাজেয়াপ্ত করেছেন। সেইজন্য ঐ গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণের প্রকাশনা ব্যাপারে খুব ব্যস্ত ছিলাম। আমার ভয় হচ্ছে আপনাকে আপনাকে হয়ত আমি হয়ত ভারগ্রস্ত করছি। কিন্তু যদি আপনি সুস্থ থাকেন ও বইটি পড়ে উঠতে পারেন তবে বলাই বাহুল্য আপনার পুস্তক সমালোচনা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠবে। 'এ লেটার টু হিন্দু' নামে যে চিঠি আপনি আমাকে প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন সেটা আমি এর সংগে পাঠাচ্ছি। ঐ চিঠি একটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হবে।

আপনাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে,
এম, কে, গান্ধী।

টলস্টয়কে লেখা গান্ধীজীর ৪র্থ চিঠি—

এম, কে গান্ধী, ১১-২৪ কোর্ট চেম্বার্স,
এটর্ণি, জোহান্সবার্গ,
১৫ই আগষ্ট, ১৯১০

ত ৮ই মে তারিখে আপনার লেখা উৎসাহ ব্যঞ্জক ও প্রীতিপূর্ণ চিঠিটি পেয়ে আমি ধন্য। আমার 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল' গ্রন্থখানিকে

আপনি যে স্বীকৃতি দিয়েছেন তা আমার কাছে খুবই মূল্যবান। আপনি চিঠিতে জানিয়েছিলেন বইটির সমালোচনা আপনি করবেন। আপনি যদি সময় করে উঠতে পারেন তবে আশা করব আপনি বইটির বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

মিঃ কালেনবাক আপনাকে টলস্টয় ফার্ম সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। মিঃ কালেনবাক ও আমি বহুদিনের পরনো বন্ধু। আপনার রচনায় 'আমার স্বীকারোক্তি' ('মাই কনফেশন') এ যা বর্ণনা করেছেন মিঃ কালেনবাক সে সব আদর্শের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছেন। আপনার রচনা মিঃ কালেনবাককে যেভাবে প্রভাবিত করেছে অন্য আর কারও রচনা তা করতে পারে নি। আমার সংগে আলোচনা করে তিনি আশ্রমটির নাম আপনার নামে দিয়েছেন। আপনার প্রদর্শিত আদর্শ অনুযায়ী জীবন গড়ে তুলবার প্রচেষ্টায় নামকরণটি প্রেরণা জুগিয়েছে।

আমি এই সংগে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'এর কয়েকটি সংখ্যা পাঠালাম। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীদের জন্য আশ্রম উন্মুক্ত করে দিয়ে কালেনবাক যে উদারতা দেখিয়েছেন, সেই বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ আপনি ঐ পত্রিকাগুলিতে পাবেন।

এতসব বিস্তারিত খবর জানিয়ে আপনার বোঝা বাড়ান আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু আপনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীদের সংগ্রাম সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন তাই লিখছি।

আপনার অতি বিশ্বাসী সেবক

এম. কে. গান্ধী।

পঞ্চম অধ্যায়

"হিন্দু টলস্টয়"

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী থেকে প্রকাশিত 'লত্রক্লেয়ার' সংবাদপত্রে একজন ফরাসী সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একদা মন্তব্য করেছিলেন—'Rabindra Nath Tagore is a kind of Tolstoy'। রবীন্দ্রনাথের সংগে টলস্টয়ের কতখানি সাদৃশ্য দেখেছিলেন কিংবা টলস্টয় রবীন্দ্রনাথকে কতখানি প্রভাবিত করেছিলেন যে, এই সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু টলস্টয় বলতে দ্বিধা করলেন না! সেকি উভয়ের প্রকৃতি প্রীতি, গ্রামীন জীবনের সরলতার প্রতি আকর্ষণ, স্বৈরতন্ত্র বিরোধী চিন্তা বা বিশ্বপ্রেম? কৌতূহল উদ্রেককারী এই মন্তব্যটিকে স্বাগত জানাই। বিশ্বসাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে সাদৃশ্য তো থাকবেই। তৌলদণ্ডে ওজন করার সময় সমালোচকগণ একের প্রতিভার ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে সামঞ্জস্য খুঁজে বেড়ান। তাই পাশ্চাত্য দেশীয় সমালোচকগণ রবীন্দ্রনাথকে কখনও ডস্টয়ভস্কি, কখনও বা চ্যেকভের সংগে তুলনা করেছেন। ('৯১৯ খ্রীঃ "দি চার্চ টাইমস্" পত্রিকায় ও ১৯২৬ খ্রীঃ "দি লণ্ডন মারকারি' পত্রিকায়) এবং ঐ একই কর্ত্তব্যবোধে ফরাসী সমালোচকের চোখে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু টলস্টয় রূপে প্রতিভাত হলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয় সমকালে জীবিত ছিলেন। বিংশ শতকের প্রথম দশকেই উভয়েরই প্রতিভার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথ (জন্ম—১৮৬১ খ্রীঃ—মৃত্যু ১৯৪১) খ্রী ও টলস্টয় (জন্ম ১৮২৮ খ্রী মৃত্যু ১৯১০) উভয়েরই সুদীর্ঘ জীবন বিপুল সাহিত্য সৃষ্টির সহায়তা করেছিল নিঃসন্দেহে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যেই টলস্টয়ের বিশ্বখ্যাত

উপন্যাস যুদ্ধ ও শান্তি (ভয়না ই মীর রচনাকাল ১৮৬৩-১৮৬৯) প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮০ খ্রীঃ প্রকাশ পেয়েছে টলস্টয়ের "আমার স্বীকারোক্তি" (My confessions) টলস্টয়ের যখন সাহিত্যিক জীবনের পূর্ণ পরিণতি এসেছে তরুণ রবীন্দ্রনাথের অপরিণত কবিকণ্ঠ বাল্মীকি প্রতিভা, সন্ধ্যাসংগীত ও কবিকাহিনীর মধ্যে স্ফুট হয়ে উঠছে। একজন ফরাসী সমালোচক সদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন—উভয়ই জমিদার পরিবারে জন্মেছেন বলে। "Both were of feudal origin (Revue Anglo-Americaino, Paris 1930) একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে টলস্টয়ের বাল্য ও কৈশোর কেটেছে ইয়াসনায়া পলিয়ানার শান্ত স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে। আর রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির স্নেহময়ী স্পর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতনের প্রশান্তির মাঝে। উভয়ই প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন শান্তির আশ্রয় রূপে কিন্তু ব্যতিক্রম উভয়ের দর্শনে। টলস্টয় বহুদর্শী, জীবনের বৈচিত্র্য দেখেছেন—শৈশবেই মাতা পিতাকে হারিয়ে মানুষ হলেন মাসীর আশ্রয়ে। তারপর নবযৌবন কেটেছে জুয়া, মদ্য ও মেয়ে ইত্যাদি ব্যসনে। সৈন্যাধ্যক্ষের অভিজ্ঞতা, যুদ্ধের ও ধ্বংসের পূর্ণ মূর্তি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। পশ্চিম ইউরোপ বেড়িয়ে দেখেছেন সেখানে শিল্পের দম্ভ। সব মিলিয়ে কোথাও তিনি পেলেন না জীবনের ভিত্তি, আত্মার শান্তি। প্রকৃতি, মাটি ও মাটির মানুষ, কৃষিজীবী মানুষের কাছে তিনি ফিরে এলেন। টলস্টয় দেখেছেন মানুষের মিথ্যাচার, দেখেছেন শক্তির অপব্যবহার দেখেছেন মানুষকে অতি বাস্তব ও নিখুঁত ভাবে কিন্তু মানুষের পতন ও পরাজয়ের মধ্যেই তিনি শেষ করেননি। শুধু ভসক্রেসেনিয়ে উপন্যাসেই নয়, সমগ্র সাহিত্য কর্মে টলস্টয় পুনরুজ্জীবনের বাণী শুনিয়েছেন। প্রেম, আত্মত্যাগ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ও ঈশ্বর আনুগত্যের মধ্য দিয়েই মানুষ নতুনতর সত্তায় জাগে—শান্তির পথ খুঁজে নেয়। অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কোলে সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টিতে

নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। অসীম প্রকৃতি তাঁকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে। মানুষের বাসনার ব্যথা, পাপের লালসা জীবনের কালি সবই নিঃসীম নীলিমায় অ-জাগতিক অস্তিত্ব লাভ করেছে। টলস্টয় তাঁর গল্প উপন্যাসে (কসাক, অ্যানাকারেনিনা রেসারাকশান, যুদ্ধ ও শান্তি, মানুষের দৈহিক বাসনা ও অশান্তির আত্মরতি ও সম্ভোগের যন্ত্রণার দিকটি বাস্তব ভাবে অংকিত করেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনের ঐ দিকগুলোকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। বরং দেহবাসনার প্রসংগে তিনি শুচিশুদ্ধ মন নিয়ে তাকে দেহাতীত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সুরদাস প্রার্থনা জানিয়েছিল তার প্রেমিকাকে—"হৃদয় আকাশে থাক না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি। বাসনা মলিন আঁখি কলংক ছায়া ফেলিবে না তায়,"। রবীন্দ্রকাব্য থেকে শুচিস্নিগ্ধ প্রেমের এই জাতীয় বহু উদাহরণ দেওয়া চলে।

প্রকৃতির মাঝে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় ও শান্তি খুঁজেছেন। শিলাইদহ অঞ্চল থেকে ১৮৯১ খ্রীঃ একটি পত্রে লিখছেন—সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি। কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ। এই লোক নিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে—(শিলাইদহ, ১ অকটোবর ১৮৯১)।

তাই "অ্যানা কারেনিনায়" মানুষের শতমুখী উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির উদ্দাম উন্মত্ততা রবীন্দ্রনাথের চোখে বিশ্রী ঠেকেছে কবির একটি পত্রে (ছিন্নপত্রাবলী—৪ই জুন ১৮৮৯) তার নিদর্শন আছে "অ্যানা কারেনিনা পড়তে গেলুম, এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না। এরকম Sickly বই পড়ে কি সুখ বুঝতে পারিনে। আমি চাই বেশ সরল সুন্দর মধুর উদার লেখা। কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।" কবির এই উক্তিটি টলস্টয়ের প্রতি

বিরূপতা বাচক নয়, বরং এই উদ্ধৃতিটি আমাদের সহজেই বুঝিয়ে দেবে ছিন্নপত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের মানস-প্রকৃতির ব্যবধান ছিল কতবেশী। কবি তখন পদ্মার বুকে বাস করছেন। চারদিকের বিস্তীর্ণ প্রকৃতির প্রতি ধরণীর প্রতি সুগভীর নাড়ীর টান অনুভব করছেন। প্রসংগত উল্লেখ করা বাহুল্য হবে না যে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও 'চোখের বালি' ও 'নষ্টনীড়ে' জটিল কুটিল মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, কবিগুরু আর টলস্টয় মূলত ঔপন্যাসিক হলেও—'ইউরোপে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত।' ভারতেরও অনেক মনীষীর মনন তাঁর প্রভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাগ্রত একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। রম্যাঁ রলাঁ দিনপঞ্জীতে লিখছেন—"ভারতবর্ষে তলস্তয় অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ, তাঁর কোনো কোনো রচনা, মহৎ উপন্যাসগুলোই নয়—জনপ্রিয় গল্পগুলো বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। দিলীপ কুমার রায় বললেন আমার নাম এবং আমার টলস্টয়ের জীবন 'বাংলাদেশে জনপ্রিয়'। ঐ দিনপঞ্জীর অন্যত্র রম্যাঁ রলাঁ জানিয়েছেন—"আমি তাঁকে (রবীন্দ্রনাথকে) জিজ্ঞেস করলাম, ভাতরবর্ষে টলস্টয় বেশ পরিচিত এবং পঠিত একথা সত্য কিনা। তিনি বললেন, তাঁর বিশ্বাস তা সত্য, কিন্তু তাঁর প্রকৃত চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে অনুপলব্ধ।"

"......বুঝতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথ তলস্তয়কে খুব পছন্দ করেন না, তিনি তাঁর মতবাদের তপশ্চর্যা এবং কঠোর সন্ন্যাসের দিকটা সইতে পারেন না। তিনি বলেন, কেনো ভারতীয়ই পারে না। ভারতবর্ষের আকাশ ও প্রকৃতি তার অনুকূল নয়। প্রকৃতির প্রতিকূলে সন্ন্যাস এবং আত্ম অস্বীকৃতি পাশ্চাত্যের পক্ষে মঙ্গলকর ঠিক এই কারণে যে, তাঁরা অত্যন্ত উগ্র এবং তাদের রিপুগুলোকে হটাতে হবে। দমনের চেয়ে উদ্দীপনই বরং ভারতবর্ষের প্রয়োজন হবে। মোটের উপর বলতে গেলে, সংঘর্ষ, চিরন্তন সংগ্রাম ছাড়া ইউরোপের শিল্পে ও

চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ আর কিছু দেখতে পান ব'লে মনে হয় না, আর তা তাঁর পছন্দ নয়।" (র‍্যম্যা র‍্যলার দিনপঞ্জী, অনুবাদ—অবন্তী কুমার স্যানাল)।

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী'র পরিশিষ্টে ম্যাকসিম গোর্কি রচিত টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে কিছু বড় তা না, এমন কি অনেক বিষয়ে হেয়। টলস্টয়ের কিছুই মন্দ ছিল না, একথা বলাই চলে না। খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, একথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু যে সত্যের গুণে টলস্টয় বহুলোকের এবং বহু কালের, তার ক্ষণিক মূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে থাকে তা হলে এই আর্টিষ্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমাদের হবে কী।" (রবীন্দ্রনাথ—পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি) টলস্টয় রবীন্দ্রনাথের কাছে একটা বিরাট পুরুষ ও বড় শক্তি নিঃসন্দেহে কিন্তু তিনি কোথাও টলস্টয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয় না। শুধুমাত্র একবার তিনি আপন মতের সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন টলস্টয়ের শিক্ষানীতির মধ্যে।

শিক্ষা সংস্কার প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারে যোগ্যতার জন্যই আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন। বাল্যকাল হতে শিক্ষার দ্বারা আমাদের নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম চরিত্রবিকার দূর করতে হবে। "গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত সেনেটে সিনডিকেটে বাঙালী থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল তাহা আমি মনে করি না। গবর্ণমেন্ট আমাদের কাছে জবাবদিহি না থাকিয়া দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি থাকা চাই। আমরা গবর্ণমেণ্টের স্মৃতির অধীনে যখন বাহ্য স্বাতন্ত্র্যের একটা বিড়ম্বনা লাভ করি তখনই আমাদের বিপদ সবচেয়ে বেশি।" এই প্রসংগে তিনি টলস্টয়ের উল্লেখ করেছেন, "বর্তমান কালে যে একটি মাত্র সাধক য়ুরোপে গুরুর আসনে বসিয়া নিরন্তর রোদন

করিয়া মরিতেছেন সেই টলস্টয় রুশিয়ার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি—And it is undesirable to let the Government while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people. It is doing this now by means of all sorts of Pseudo—educational establishments which it controls Schools, high Schools, Universities, academies and *all kinds of committees and Congress. But good is good and quite enlightened* and not when it is toned down to meet the requirement of Deloanojs of Dournovo's circulars." (শিক্ষা সংস্কার—রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড)।

অবশ্য এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষার সংস্কার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের মতামতের সাদৃশ্যটি নিতান্তই ক্ষীণ। নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ অন্যের মতামতের উদ্ধৃতি কখনও ব্যবহার করেন না। কিন্তু 'শিক্ষা সংস্কার' প্রবন্ধের শেষে টলস্টয়ের চিন্তাধারার সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেইদিক থেকে উদ্ধৃতিটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রুশদেশের আমন্ত্রণে ওদেশে ভ্রমণ করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওদের শিক্ষাবিধি দেখা। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র কয়েক বছরে ওদের আমূল পরিবর্তন কবি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন। "যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরুক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সংগে সমাজ আসন পাবার অধিকারী। "(রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৩৯) এতে সহজেই অনুধাবন করা চলে যে রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের শিক্ষানীতির প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। টলস্টয়ের মৃত্যুর পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক রুশদেশে

শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ব্যাপকতা ও লোক কল্যাণমুখীন তা উভয় মনীষীরই আরাধ্য আদর্শ ছিল। টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ই বিশ্বাস করেন শিক্ষার পরিমাপ শুধু সংখ্যায় নয় ; তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবাদী কবি, আর টলস্টয় মানবতাবাদী ঔপন্যাসিক। উপনিষদের আলোকে কবি রবীন্দ্রনাথ জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সত্যের আনন্দস্বরূপ ধূলিতে মূর্তি নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হিউম্যানিজম, বা মানববিকতাবোধ মানুষকে আত্ম-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আকুলতা অনুভব করেছে। ধর্মপ্রবন্ধে বলেছেন—"মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন"। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বস্তুগত দিক থেকে মানুষের জীবনকে পরিবর্তিত করার কথা ভাবেন নি। সমাজের শোষন, অত্যাচার, বঞ্চনা মুক্ত হয়ে মানুষ তখনই আত্মশক্তিকে পুনর্জীবন লাভ করবে যখন সে সমাজের এই ঘৃণ্য ব্যবস্থাকে জয় করতে পারবে। অপরদিকে টলস্টয়ের সাহিত্য ও দর্শন প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত। বহু বিচিত্র জীবনের রূপ রসে তিনি অবগাহন করেছেন। তিনি জীবনবাদী মানুষকে ভালবেসেছেন। বাস্তবের মানুষকে তিনি দোষে গুণে বারবার আবিষ্কার করেছেন। পাপের পংকে ডোবা মানুষকে হাত ধরে তুলে এনেছেন—স্বর্গরাজ্যের পথ দেখিয়েছেন। তাঁর মানবতাবাদের ভিত্তি সমাজতন্ত্র, রুশোর মতে তিনি বিশ্বাসী, যদিও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের নামে ধনিক সম্প্রদায়ের আধিপত্য চান নি তিনি। বিলাসজীবী শ্রেণীর অবলুপ্তি ও শ্রম মুখী গ্রামীণ কৃষক সম্প্রদায় ও সরল কৃষি জীবনই তাঁর মতবাদ সরাসরি ভাবে রুশ বিপ্লবকে হয়তো সহায়তা করে নি। কিন্তু পরোক্ষে যুগকে করেছে প্রসস্ত। জনমতকে বিদ্রোহের বাণীতে দীক্ষিত করেছে। তাঁর রচিত সাহিত্য সৌন্দর্যের অভিসারে সার্থক নয়। বরং জনগণ ও জনসমস্যার প্রতি একান্তভাবে নিষ্ঠাযুক্ত। রুশদেশ যে একটা বড় সত্যের সন্ধান পেয়েছে যে আজকের দিনে য়ুরোপের

মধ্যে রুশদেশে একটা বিরাট সমাজ সাধনার লীলাক্ষেত্র রচিত হয়েছে তার জন্য টলস্টয়ের মহতী চিন্তা ও বাস্তবধর্মী সাহিত্য অনেকটা দায়ী। রম্যাঁ রলাঁ একস্থানে বলেছেন—"টলস্টয়ের মন বেশী রুশ। তাঁর প্রতিভা বিরাট এত বিরাট যে তাঁর প্রবল দানবীয় দৈহিক আকাঙ্খাকেও জয় করে সে শিল্প হয়ে উঠল মহিমময়। তিনি ছিলেন বিরাট পুরুষ—তাঁকে বলা চলে প্রকৃতির এক প্রকাণ্ড শক্তি প্রপাত।" সেই প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে রচিত হয়েছে—তাঁর 'ভয়না ই মীর' (War and Peace) অ্যানা কারেনিনা, ও ভস্ক্রেসেনিয়ে (Resurrection)

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় টলস্টয়ের উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোথাও সপ্রশংস হয়ে ওঠেনি। আনাকারেনিনা সম্পর্কে মতটি আগেই উল্লেখ করেছি। টলস্টয়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'রেসারেকশন' সম্পর্কে তিনি (রাশিয়ার চিঠি, পৃ ৪৯) মন্তব্য করেছেন—'আমি যেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টলস্টয়ের রেসারেকশন। জিনিসটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনছিল। অ্যাংলোস্যাকসন চাষী মজুর শ্রেণীর লোকে একটা পর্যন্ত এমন শান্তভাবে উপভোগ করছে একথা মনে করা যায় না আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দাও।" যথার্থই এই মন্তব্য। পাঠক একবার ভাবুন তো আমাদের দেশের অশিক্ষিত চাষীরা রবীন্দ্রনাথের গোরা কিংবা ঘরোবাইরের অভিনয় উপভোগ করছে রাত একটা পর্যন্ত। —এইখানেই দুই সাহিত্যকারের পার্থক্য। টলস্টয়ের রচনা মানবমুখী, জনগমনের উপযোগী আর রবীন্দ্রনাথ মহামানবের সাগর তীরে দাঁড়িয়েও সম্পূর্ণভাবে মানুষের কাছে আসতে পারেননি। কবির এই বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—"আমার কবিতা, জানি আমি, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।" "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও কয়েকটি আখ্যান কেন্দ্রিক কবিতার হিসেব হাতে রেখেও উপরের মন্তব্যটি দ্বিধাহীন ভাবে মেনে নিতে হয়।

সাহিত্য তত্ত্ব সম্পর্কিত ধ্যান ধারণাতেও রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন শিল্পের প্রয়োজনে শিল্প। শুধু তাই নয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু হচ্ছে শিল্প। সৌন্দর্য্য প্রয়োজনের বাড়া। এই সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য একাংগী। কাজেই সাহিত্যের সংগে দৈনন্দিন প্রয়োজনমুখী বাস্তবতার সম্পর্ক নেই। সাহিত্য আনন্দ দান করে—অপ্রয়োজনের আনন্দ, সৌন্দর্যের আনন্দ ও আত্মোপলব্ধির আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের বিবিধ প্রবন্ধে সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর শিল্প ও সাহিত্যের মূলনীতি বিশ্লেষণ করেছেন। অপরদিকে শিল্প বিষয়ে টলস্টয়ের মতবাদ স্পষ্ট ও সোচ্চারিত হয়ে উঠেছে What is Art—গ্রন্থে। শিল্প একটা সামাজিক কর্ম। সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচিত হয় না। সমাজে প্রতিটি মানুষ এক একটি কর্মে নিযুক্ত। সাহিত্যিকও তেমনি একটি কর্মে লিপ্ত আছেন। সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে হয় সমাজসেবা, মানবতার সেবা। অত্মোপলব্ধির আনন্দ নয়—বাস্তবতা ও সমাজের প্রতি প্রতিটি শিল্পী বৃহত্তর সমাজ জীবনের অংশীদার। বিষয়কে দুরূহ ও সুকর্ষিত করাই শিল্প নয় বরং বিষয়টি যেন সকলের সহজ গোচর হয়। "Good art always pleases every one" টলস্টয় মনে করেন সাহিত্যিক আপন জীবন সত্যকে অপরের হৃদয়ে যখন পৌঁছে দিতে পারেন—তখনই শিল্পীর সার্থকতা। Art begins when someone with the object of making others shares his feelings, exprerses that feeling by certain external indications.

টলস্টয় রবীন্দ্রনাথের মত কলাকৈবল্য বাদী নন। শিল্পের জন্যই শিল্প নয় কিংবা সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই শিল্প নয়—। শিল্প হবে সত্য ও জীবকল্যাণমুখী। তাঁর মতে প্রকৃত শিল্পকর্মের জন্য প্রয়োজন—তিনটি বস্তুর। বিষয়বস্তু—যা হবে মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও অভিনব, আংগিক যা হবে সর্বজনবোধ্য আর সর্বোপরি চাই শিল্পীর

জীবনচেতনার অভিব্যক্তি। সৌন্দর্য বলতে টলস্টয় বুঝিয়েছের মঙ্গল ও নৈতিকতা। তাঁর সৌন্দর্য বোধের সংগে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শনের কিছুটা সাদৃশ্য পাওয়া যার—মঙ্গল মূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণ মূর্তি।

What is Art গ্রন্থ খানি রবীন্দ্রনাথ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেই পড়ে ফেলেছেন। কিন্তু শিল্পকী এই আলোচনায় তিনি টলস্টয়ের সংগে একমত হতে পারেন নি। তাঁর লিখিত ৫ অকটোবর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পত্র থেকে জানতে পারি "Tolstoy এর What is Art নামক বই পড়বার জন্যে সুরেন আমাকে পাঠিয়েছেন। আজ হস্তগত হল। এখনো পড়িনি। বোধ হচ্ছে Art সম্বন্ধে তিনি একটা নূতন পথে গেছেন। কিন্তু সমস্ত বড় বড় বিষয়ে পথ একটা বই নেই এবং সে পথ অতি পুরাতন—অপথের অন্ত নেই। "—(চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড, ১৩১ নং পত্র) আবার ঐ সালেই ৯ অকটোবরের লেখা পত্রে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ "সকাল বেলায় Tolstoy র বইখানা দেখছিলুম। ওর সঙ্গে মতে মিলিনে কিন্তু খুব Suggestive। আমার ইচ্ছে করছে ওর বিস্তৃত সমালোচনা করে একটা বড় প্রবন্ধ লিখি তার মধ্যে আমার মতটা বেশ বিস্তৃত করে বলতে পারি।...সৌন্দর্য্য ও আর্টসম্বন্ধে ইস্তক নাগাদ যত মতামতের সৃষ্টি হয়েছে টলস্টোয় তার একটা চুম্বক দিয়ে তার উপরে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেচেন। এ বইটা যদি না পড়ে থাক ত পড়া আবশ্যক।" (চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড, ১৩৩ নং পত্র)

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"সেই সত্য যা রচিবে তুমি, কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।" —আর টলস্টয় সত্য বলতে বোঝেন বাস্তব সত্য, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সত্য। কল্পনা নয়, সন্দোর্য নয়, যা কিছু মানবজীবনে শ্রেয়ো সেই পরম শ্রেয়ো বোধের উপরই টলস্টয়ের সত্য নির্ভরশীল। তাঁর রচিত সাহিত্যে তাই মঙ্গলের মধ্যে, কল্যাণের মধ্যে দ্বন্দ্বমুখর মানুষকে অমৃতের সন্ধান দিয়েছেন। 'তাঁর এই বিশিষ্ট শিল্পবোধই পরবর্তীকালের রুশ

সাহিত্যের আদর্শ। লেনিন ও গোর্কি তাঁর জীবনমুখী শিল্পবোধ ও বাস্তবধর্মী সাহিত্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

লিও টলস্টয়কে মহামতি লেনিন "The Mirror of the Russian Revolution" হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। লেনিনের বক্তব্য টলস্টয়কে বুঝতে সাহায্য করবে। তাই সেটা উদ্ধৃত করা হল Tolstoy is original because the sum total of his views, taken as a whole, happens to express the specific features of our revolution as a peasant bourgeois revolution From this point of view the centradictions in Tolstoy's views are indeed a mirror of those contradictory conditions in which the peasantry had to play their historical part in our revolution···Tolstoy's ideas are a mirror of the weaknen the short comings of our peasant revolt, a reflection of the flabbiness of the patriarchal countryside and of the hidebound cowardice at the enterprising muzhik" (V.I. Lenin, on Literture and Art)

নানা দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্যনীয় তবে মহৎ শিল্পী ও মহৎ ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথাও যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নিপীড়িত আত্মার জন্য উভয় মনীষীর অন্তরে ছিল অফুরন্ত প্রেমের উৎসার। বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের হৃদয়দুয়ার সদাই উন্মুক্ত থাকত। সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে উভয়ই বারবার নানাভাবে সোবিচার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নোবেল পুরষ্কারের অধিকারী এই দুই সাহিত্যিক যান্ত্রিক সভ্যতার ভয়াবহতা ও নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে বারবার অবহিত করতে চেষ্টা করেছেন।

এই কারণেই—হয়তো কেউ কেউ কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ও ঋষি টলস্টয়ের চিন্তায় সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেনে ও 'হিন্দুটলস্টয়' নামে রবীন্দ্রনাথকে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও টলস্টয়ের ইয়াসনায়া পলিয়ানার মধ্যে মিল আছে সত্য। কিন্তু উভয়

পল্লীই আপন আপন বৈশিষ্ট মণ্ডিত ও স্বয়ং সৃষ্ট। একটির প্রভাবে আর একটি গড়ে উঠেছে মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে ও সমগ্র বিশ্বে সর্বত্র অতিপূজ্য টলস্টয়ও তাই। উভয়েরই প্রতিভা ও সৃষ্টি দেশকালাতীত। তবুও বলব এই দুই মহৎ জীবন প্রায় একই কালে বর্তমান থেকেও স্বতন্ত্র।

উভয় মনীষীর মনস্বিতা বিশ্বমানবতাবোধ যদি সাদৃশ্যের একমাত্র ভিত্তি হয় তবুও বলব সেখানেও কিছু মিলের অভাব আছে। টলস্টয় সর্বপ্রথম রুশ, তারপর বিশ্বের। আর রবীন্দ্রনাথকে ঠিক ভূগোলের সীমায় আবদ্ধ করা চলে না। টলস্টয়কে তাঁর স্বীকারোক্তির মধ্যে রুশ দেশীয় 'নারোদনিক' গোষ্ঠীর সমর্থক রূপে পাওয়া যায়।

এমনকি মহামতি লেনিন তাঁর সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে বিপ্লবের বাণীকে প্রত্যক্ষ করেছেন—"Tolstoy reflected the pent-up hatred, the ripened striving for better lot, the desire to get rid of the past—and also the immature dreaming, the political inexperience, the revolutionary flabbiness." (V. I. Lenin, On Literature and Art, Page 32, Progress Publishers).

বর্তমান সোভিয়েত দেশ টলস্টয়কে গ্রহণ করেছে। অন্তর্দ্রষ্টা ঋষির সৃষ্টিতে বিপ্লব যুগের—দ্বিধাদ্বন্দ্বমুখর সত্য ছবি আগেই প্রস্ফুটিত হয়েছিল। খ্রীষ্ট প্রচারিত সাম্য সমাজ তাঁর কাম্য। অবশ্য বলা বাহুল্য টলস্টয় বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বধর্মের আদর্শেই উদ্বুদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশ একটা মানসিক অস্তিত্ব। সেইজন্যই এক বিশিষ্ট অর্থে রবীন্দ্রনাথের কোন দেশ নেই, সমগ্র বিশ্বই তাঁর দেশ। "দেশে দেশে মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া"। মানব বিশ্ব তাঁর নিকট এক এবং অখণ্ড। জাতিগত, গোষ্ঠীগত, রাষ্ট্রগত বৈষম্যকে স্বীকার করেন নি তিনি। জাতীয়তাবাদ তাঁর কাছে সংকীর্ণ ও নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে ভালবাসেন নিজের দেশবাসীকে ভালবাসেন।

বাংলার আকাশ, বাতাস, জল, ফুল, ফল সবই তাঁর নিজের সামগ্রী

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি। কিন্তু, সংগে সংগেই কবি বাংলামায়ের মুখে বিশ্বমাতার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলেন।

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার' পরে ঠেকাই মাথা।

তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।" আর তখনই কবির বিশ্ব চেতনা ও স্বদেশ চেতনা একাকার হয়ে যায়। একটাই ধর্ম পৃথিবীতে বিশ্বধর্ম, একটাই মতবাদ বিশ্বমানবতাবাদ। কাজেই তিনি যখন প্রৌঢ় বয়সে সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমন করলেন তখন তিনি নির্দ্বিধায় বিশ্ববোধের দার্শনিক প্রত্যয়ে প্রশংসায় উল্লসিত হয়ে উঠলেন—

"রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস।...সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নুতনের জন্যে একেবারে নুতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের জাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে সেটা দেখে আমি সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছি ...বহুদূর ব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নুতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি) সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে দেখে এই মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ। শুধুমাত্র বিস্ময় প্রকাশই নয়। সৌন্দর্যবাদী কবির চেতনায় ও কিছুটা রুশ সমাজতন্ত্রের ঢেউ লেগেছে। কবির স্বীকারোক্তি "শান্তিনিকেতনের আকাশে শালবনের উপরে মেঘের ছায়া এবং জলের ধারায় শ্রাবণ ঘনিয়ে উঠেছে। সেই ছবি মনে জাগলে আমার চিত্ত কী রকম উৎসুক হয়ে উঠে।...কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌদর্যের ছবি আমার

মন থেকে মুছে গেছে। কেবলই ভাবছি আমাদের দেশজোড়া চাষীদের দুঃখের কথা"।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু টলস্টয় নন। কিন্তু টলস্টয়ের প্রাচ্য প্রীতি, ভারতীয় দর্শনের প্রতি গভীর আকুতি, ততকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থার অতি গভীর সহানুভূতি এবং ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সংগে আত্মার আত্মীয়তা—সবকিছু মিলিয়ে লিও টলস্টয়কেই আমরা 'হিন্দু টলস্টয় এই বিশেষণটি আরোপ করতে পারি।

টলস্টয়ের বিভিন্ন রচনায়, চিঠিপত্রে ও ডায়েরিতে তাঁর ভারত-প্রীতির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ১৮৫৭—৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে ভারতীয়দের উপর ইংরেজদের জঘন্য নৃশংসতা তাঁকে ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল করেছিল। টলস্টয় আগ্রহের সংগে ভারতীয় বীরদের যুদ্ধের কাহিনী পড়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সাতের ও আটের দশকে টলস্টয় হিন্দু দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। বেদ উপনিষদ থেকে তিনি আত্মার শান্তির বাণী খুঁজে পেলেন। বহু বছর ধরে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ইয়াসনায়া পলিয়ানাতে তাঁর গ্রন্থাগারে বহু ভারতীয় গ্রন্থ আছে যেগুলি তিনি যত্ন সহকারে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে পাঠ করেছিলেন। উনিশ বছর বয়সেই টলস্টয় একজন বৌদ্ধলামার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের মূলতত্ত্ব জানতে পেরেছিলেন সেটা আমরা রম্যাঁ রলাঁ রচিত টলস্টয়ের জীবনী থেকে অবগত হই। গৌতম বুদ্ধের জীবন ও বাণী তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ১৮৮৯ খ্রীঃ তিনি বুদ্ধকে নিয়ে একটা প্রবন্ধ রচনা করেন। এমনকি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর দুই মাস আগে ডায়েরির পাতাতে বুদ্ধকে নিয়েই কিছু রচনা পাওয়া যায়। শুধু বুদ্ধদেব নন, শংকরাচার্য, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ—সব হিন্দু দার্শনিকদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দের

মানবতাবাদ ও ভারতীয় জনজাগরণের জন্য বীরত্বময় আহবান টলস্টয়কে বেশী মুগ্ধ করেছিল। তিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বিবেকানন্দ দর্শন সম্পর্কে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন।

বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারত ও ভারতীয় লোক সাহিত্য টলস্টয় পাঠ করেছিলেন। টলস্টয় বেদের পাঠক মাত্র ছিলেন না—তিনি রুশদেশে বেদকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এটা ভাবতে সত্যি অবাক লাকে টলস্টয়র মত মনীষী যিনি বারবার ভারতীয় বেদ উপনিষদ পাঠ করে তৃপ্ত হয়েছেন, অথচ রবীন্দ্রনাথ যিনি উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত এবং তাঁরই সমকালীন কবি তিনি কিন্তু টলস্টয়ের জানবার আগ্রহ থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। টলস্টয় ভারতীয় পুরাণ হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের গল্প থেকে রসাস্বাদন করেছেন বারবার। ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাদর্শকে জীবনের পাথেয় করেছিলেন, সমকালে বিবেকানন্দ দর্শন ও গান্ধীজীর অ-প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত ছিলেন। অথচ রবীন্দ্রসাহিত্য বা দর্শন কোনটাই তাঁর আগ্রহকে জাগ্রত করে নি। কাজেই পাশ্চাত্য সমালোচকের উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের প্রতি সত্য নয়; বরং 'হিন্দুটলস্টয়' এই বিশেষণে লিও টলস্টয় ভারতীয়দের কাছে অনেক বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন।

'ভারত পথিক লিওটলস্টয়' প্রকাশের প্রাক্-পর্বে শ্রদ্ধেয় চিন্মোহন সেহানবীশের কাছ থেকে টলস্টয় সম্পর্কে আরও কিছু নতুন তথ্য জানা গেল তাঁর লেখা একটি চিঠিতে। চিঠিটির প্রতিলিপি তুলে দিলাম।

ঝরা,

তোমার 'ভারত পথিক লিও টলস্টয়' এর জন্য দু'টো বাড়তি তথ্য জানাচ্ছি :

১। ১৯১৯ সালের ৭ই মে মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে পাঁচ জন ভারতীয় বিপ্লবীর একটি প্রতিনিধি দল ক্রেমলিনে লেনিনের সঙ্গে দেখা করে। আগের দিন লেনিনের নির্দেশে ক্রেমলিন থেকে একজন রাজপুরুষ এসে মহেন্দ্র প্রতাপের কাছ থেকে তাঁর লেখা 'Religion of Love' বইটি নিয়ে যান। সাক্ষাৎকারের দিন মহেন্দ্র প্রতাপ জানতে চান লেনিন তাঁর বইটি দেখেছেন কিনা। লেনিন জানান তিনি বইটি পড়ে ফেলেছেন আর তাঁর দেশেও টলস্টয়ের মতো মানুষের চিন্তাও ঐ ধরনেরই।

২। লেনিন কোন বড় রচনায় হাত দেবার আগে ছোট করে তার 'নোটস' করতেন পৃথকভাবে। এ ক্ষেত্রে তাঁর মাথায় যা ছিল লেনিন সেটি লিখে যেতে পারেননি। শুধু সংশ্লিষ্ট 'নোটসে'র মধ্যে ছিল এই কথা :

World of Socialism, World Capitalism, In between the Hindu disciple of Tolstoy. টলস্টয়ের 'হিন্দু' অর্থাৎ ভারতীয় শিষ্য অবশ্য গান্ধীজী। ঠিক কি মনে করে লেনিন এ-কথা লিখেছিলেন জানিনা। লেনিনও তার কোন হদিশ রেখে যান নি।

১৫, ৬, ৮৩ চিনুদা

টলস্টয়ের জীবনের প্রধান ঘটনাপঞ্জী

১৮২৮—২৮শে আগষ্ট কাউন্ট নিকোলাই ইলিচের চতুর্থ পুত্র লিও নিকোলা-
(পুরাতন পঞ্জিকা অনুযায়ী)
য়েভিচ টলস্টয় তুলা প্রদেশের ইয়াসনায়া পলিয়ানাতে জন্ম গ্রহণ করেন।

১৮৪৪—কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রথমে প্রাচ্য ভাষা ও পরে আইন পড়েন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৮৪৭—কাজান বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে ইয়াসনায়া পলিয়ানাতে ফিরে এলেন জমিদারী কাজকর্ম দেখবার জন্য।

১৮৪৯—সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন। নিজের গ্রামে দরিদ্র কৃষক শিশুদের জন্য স্কুল খোলেন।

১৮৫১—ভাই নিকোলাই এর সংগে ককেসাস এ যান। নবেম্বর মাসে Childhood লিখতে স্বরু করেন।

১৮৫২—ফেব্রুয়ারী—সেনা বিভাগে যোগ দেন

সেপ্টম্বর—contemporary-তে-childhood প্রকাশিত হয়।

১৮৫৩—মার্চ contemporary তে The Raid প্রকাশিত হয়।

১৮৫৪—মার্চ—ক্রিমিয়ার যুদ্ধ স্বরু হল। টলস্টয় উচ্চতর সামরিক অফিসারের পদ পেলেন।

অক্টোবর—Contemporayতে Boyhood প্রকাশিত হল।

নভেম্বর—সিভাস্তপোলে তিনি এলেন।

১৮৫৫—মে—Sevastopol in December প্রকাশিত।

সেপ্টেম্বর—Sevastopol in May প্রকাশিত।

নভেম্বর—সেণ্ট পিটার্সবার্গে ফিরে এলেন।

১৮৫৬—জানুয়ারী—Sevastopol in August প্রকাশিত।

নভেম্বর—সামরিক বাহিনীর কাজ ছেড়ে দিলেন।

Land Lord's Morning প্রকাশিত হল।

১৮৫৭—Youth প্রকাশিত হল। ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ও জার্মানীজে বেড়াতে গেলেন।

১৮৫৯—Three Deathes, Family Happiness প্রকাশিত হল।

১৮৬০—বিদেশে ভ্রমণ—জার্মানীতে যান। ভাই নিকোলাই এর মৃত্যু ঘটল।

১৮৬১—এপ্রিল—রাশিয়ায় প্রত্যাগমন। তুর্গেনিভের সংগে মতানৈক্য। শান্তির দূত হিসেবে কাজকর্ম। গ্রামের স্কুলের উন্নতিকল্পে সক্রিয় ভূমিকা।

১৮৬২—সেপ্টেম্বর—সোফিয়া আন্দ্রেয়েভনা ভেরকে বিবাহ।

১৮৬৩—The Cossacks ও Polikusha প্রকাশিত।

১৮৬৩—War and Peace লিখতে সুরু করেন।

১৮৬৫—War and Peace প্রথম পর্ব প্রকাশিত।

১৮৬৬—একটি সাধারণ সৈনিকের পক্ষ নিয়ে আদালতে মামলা লড়েন।

১৮৬৯—War and Peace সমাপ্ত হল।

১৮৭২—A Prisoner in the Caucasus ও ABC Book প্রকাশিত হল।

১৮৭৩—সামারার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। Anna Kareninaর লেখার কাজ সুরু হয়।

১৮৭৭—Anna Kareninaর প্রকাশ। রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সুরু। ধর্মীয় সমস্যা নিয়ে চিন্তা সুরু করলেন।

১৮৭৮—তুর্গেনিভের সংগে ভুল বুঝাবুঝির অবসান।

১৮৭৯—A Confession লিখতে সুরু করেন।

১৮৮০—A Criism of Dogmatic Thetlogy এবং Harmeny of the four Gospels এর অনুবাদ সুরু করেন।

১৮৮২—What Men Live By প্রকাশিত। পরিবারবর্গ নিয়ে মস্কোতে বসবাস।

১৮৮৩—What I Believe লিখলেন।

১৮৮৪—What I Believe বাজেয়াপ্ত করা হল। তাঁর স্ত্রী 'টলস্টয়ের প্রকাশ করেন।

১৮৮৫—নিরামিষভোজী হয়ে উঠলেন। শিকার করা ছেড়ে দিলেন।

১৮৮৬—The Deptn of Ivan Ilyich. How Much Land does a Man Need? প্রকাশিত হল। What Then Must We Do? রচনাটি সমাপ্ত করলেন। Ivan the Fool ও The Power of Darkness লিখতে সুরু করেন।

১৮৮৮—Strider প্রকাশিত। The Power of Darkness প্যারীতে অভিনীত হল।

১৮৮৯—The Kreutzer Sonata সমাপ্ত করলেন। Resurrection লেখার কাজ সুরু। The Fruits of Enlightenment ইয়াসনায়া পলিয়ানাতে অভিনীত হল।

১৮৯১—সম্পত্তি ও কপিরাইটের বিলিব্যবস্থা। দুর্ভিক্ষ।

১৮৯২—দুর্ভিক্ষ তাড়িতদের জন্য সেবা।

১৮৯৩—The Kingdom of God is withthin you লিখলেন।

১৮৯৪—Christianity and Patiotism লিখলেন। মঁপাসা রচনাবলীর অনুবাদের ভূমিকা লিখলেন।

১৮৯৫—Masters & Man প্রকাশিত। The Power of Darkness মস্কোতে অভিনীত হল।

১৮৯৬—How to Read the Gospels লিখলেন। দুখোবরদের সাহায্যের জন্য আবেদন করে লেখা Help! প্রকাশিত হল।

১৮৯৮—What is Art ইংলণ্ড থেকে প্রথম প্রকাশিত হল।

১৮৯৯—Resurrection প্রককাশিত। দুখোবরদের কানাডা যাবার জন্য সাহায্য দান।

১৯০০—The Live Corpse লিখলেন। গর্কির সংগে সাক্ষাৎ।

১৯০১—অর্থডক্স চার্চের সংগে যোগাযোগ ছিন্ন হল। ক্রিমিয়াতে চেকভ ও গর্কির সংগে দেখা-সাক্ষাৎ।

১৯০২—What is Religion? সমাপ্ত হল।

১৯০৪—Shakespeare and the Drama নিয়ে লিখলেন। Hadji Murad লেখা শেষ হল। রুশ-জাপান যুদ্ধের সম্পর্কে লেখা Be think Yourselves, রচনাটি ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত হল।

১৯০৫—রাশিয়ায় বিপ্লবের সূচনা।

১৯০৬—A circle of Reading সংকলন করেন। প্রিয় কন্যা মাবার মৃত্যু।

১৯০৮—১৯০৫-এর বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে লিখলেন I can not be Silent.

২৮শে আগস্ট—তাঁর আশি বছরের জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়।

১৯০৯—তাঁর সচিব গুসেভ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ও তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। স্ত্রীর সংগে মনোমালিন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। উইল তৈরী করেন।

১৯১০—২৮শে অক্টোবর গৃহত্যাগ। ৭ই নভেম্বর—(পুরাতন পঞ্জিকা অনুয়ায়ী) আস্তাপভ রেল স্টেশনে মৃত্যু।

বাঙলা ভাষায় অনূদিত টলস্টয়ের গ্রন্থের তালিকা

	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা
১।	কর বিমল	জীবন স্মৃতি	১৯৫৫	ইণ্ডিয়ানা, কলিকাতা
২।	গুহ চারুচন্দ্র	টলস্টয়ের গল্প বিংশতি	১৯২০	ঢাকা থেকে প্রকাশিত
৩।	ঘোষ চিত্তরঞ্জন	গল্প সংগ্রহ	১৯৭০	বিংশ শতাব্দী, কলিকাতা
৪।	ঘোষাল সাবিত্রী	শৈশব, কৈশোর, যৌবন	১৯৫৭	কে, গাঙ্গুলী, কলিকাতা
৫।	চট্টোপাধ্যায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ	এ যুগের অভিশাপ	১৯৫২	বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা
৬।	চক্রবর্তী অমিয় কুমার	নীড়	১৯৫৬	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, কলিকাতা
৭।	চক্রবর্তী কৃষ্ণ	রাহু	১৯৪৮	অগ্রণী বুক ক্লাব, কলিকাতা
৮।	চক্রবর্তী অনিলেন্দু	তিন ঋষি	১৯৪৫	মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা
৯।	চক্রবর্তী অনিলেন্দু	তীর্থ যাত্রী	১৯৪?	মিত্র ও ঘোষ, ”
১০।	চক্রবর্তী মঞ্জরী	টলস্টয়ের গল্পকথা	১৯৫৮	ইষ্টার্ন ট্রেডিং কোং ”
১১।	দত্ত মনীন্দ্র	কতটা জমি দরকার	১৯৫৭	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, কলিকাতা
১২।	দত্ত মনীন্দ্র	টলস্টয় উপন্যাস সমগ্র	১৯৮২	তুলি কলম, কলিকাতা
১৩।	দত্ত সরোজ কুমার	পুনর্জীবন	১৯৫৭	ইষ্টার্ন ট্রেডিং কোং, কলিকাতা
৪১।	দত্ত সরোজ কুমার	সিবাস্তপোলের কাহিনী	১৯৫৬	” ” ” ”

১৫।	নন্দী ললিত মোহন	রামধনু	১৯২৪	আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা
১৬।	নাথ দ্বিজেন্দ্রলাল	শিল্পের স্বরূপ		পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ্, কলিকাতা
১৭।	বীরভদ্র	টলস্টয়ের গল্পগুচ্ছ	১৯৩৭	চক্রবর্তী সাহিত্য ভবন, বজবজ
১৮।	ভট্টচার্য গৌরীশংকর	আনা কারেনিনা	১৯৪২	মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা
১৯।	” ” ”	কসাক	১৯৪৬	গুপ্ত প্রকাশিকা, কলিতাতা
২০।	” ” ”	ওয়র এণ্ড পীস	১৯৪৪	মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা
২১।	” মনোজ	ইভান ইলিচের মৃত্যু	১৯৫২	গ্রন্থজগৎ, কলিকাতা
২২।	মিত্র শিশির কুমার	বন্দী	১৯২৩	শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা
২৩।	” ” ”	বোকা ইভান	১৯২৩	” ” ” ”
২৪।	” ” ”	সপ্তর্ষি	১৯২৩	” ” ” ”
২৫।	মুখোপাধ্যায় দুর্গামোহন	বোকার কাণ্ড	১৯২৫	বরোদা এজেন্সি, কলিকাতা
২৬।	” ” ”	এ যুগের দাসত্ব	১৯২৩	” ” ”
২৭।	” ” ”	টলস্টয়ের আরও গল্প	১৯৪৯	বৃন্দাবন ধর, কলিকাতা
২৮।	মিত্র শিশির কুমার	গ্রীসের উপকথা	১৯২৩	শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা
২৯।	মিত্র শিশির কুমার	লাভের উৎপত্তি	১৯২৩	শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা
৩০।	মিত্র খগেন্দ্র নাথ	রেজারেকশন	১৯৫৪	ইউ, এন, ধর, কলিকাতা

৩১।	মুখোপাধ্যায় বিমলাপ্রসাদ	শয়তান	১৯৪৯	মিত্রালয়, কলিকাতা
৩২।	রায় কামিনী	ধর্মপুত্র	১৯০৭	মজুমদার প্রেস, কলিকাতা
৩৩।	সেন-চণ্ডীচরণ	চল্লিশ বৎসর	১৯০৩	বেঙ্গলী প্রেস, কলিকাতা
৩৪।	সেন সমর	কসাক	তারিখ নেই	বিদেশী ভাষা সাহিত্য

বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত টলস্টয় বিষয়ক গ্রন্থের তালিকা

	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকের নাম ঠিকানা
১।	গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ	সাহিত্যের ছোট গল্প	১৯৫৮	ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা
২।	চট্টোপাধ্যায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ	টলস্টয়	১৯৫৪	শরৎ সাহিত্য ভবন, কলিকাতা
৩।	চৌধুরী নারায়ণ	লিও টলস্টয় : জীবন ও সাহিত্য	১৯৮০	পপুলার লাইব্রেরী, কলিকাতা

৪। দত্ত সত্যেন্দ্রনাথ	ঋষি টলস্টয় ('কুহু ও কেকা গ্রন্থের ১৯৩৯ পৃষ্ঠায়)	১৯১২	ইণ্ডিয়া পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা
৫। দাস ঋষি	টলস্টয়ের স্মৃতি	১৯৪৮	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা
৬। দাস ঋষি	ছোটদের টলস্টয়		অশোক পুস্তকালয়, কলিকাতা
৭। দাস পীযুস	লেনিন, ভালাদিমির ইলিচ		ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা
৮। দাসগুপ্ত শশীভূষণ	টলস্টয়, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ	১৯৬২	মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা
৯। নাগ সুনীল কুমার	বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সংগম	১৯৬৬	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা
১০। বসু নারায়ণী	কাউণ্ট লিও টলস্টয়	১৯৬০	ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা
১১। মুখোপাধ্যায় ভোলানাথ	লেখকদের প্রেম	১৯৬২	বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা
১২। মুখোপাধ্যায় ভবানী	বিশ্ব সাহিত্যের লেখক	১৯৬৩	এম, সি, সরকার, কলিকাতা
১৩। মুখোপাধ্যায় দুর্গামোহন	ঋষি টলস্টয়	১৯২৪	বরোদা এজেন্সি, কলিকাতা
১৪। রায় অন্নদাশঙ্কর	টলস্টয়		
১৫। স্যান্যাল দীপ্তেন্দ্র	বিশ্ব সাহিত্যের সূচিপত্র	১৯৬৪	বাক সাহিত্য, কলিকাতা
১৬। সমাধ্যায়ী মোক্ষদাচরণ	টলস্টয়ের জীবন	১৯২১	এস, এন, ঘোষ, কলিকাতা
১৭। সরকার হেমন্ত কুমার এবং	বিপ্লবের পঞ্চ ঋষি (রুশো, মজিনি মার্কস, বাকুনিন ও টলস্টয়)	১৯২৩	ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা

কয়েকটি সংশোধন

অসাবধানতাবশতঃ কয়েকটি শব্দের বানান ভুল ছাপান হয়ে গেছে। পাঠকদের কাছে মুদ্রণ প্রমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কয়েকটি সংশোধন দেওয়া হল।

(ক) প্রমচাঁদ নয়, প্রেমচাঁদ (পৃঃ ১২)

(খ) প্রবাদগুলি নয়, প্রবন্ধগুলি (পৃঃ ১৭)

(গ) প্রাতীচ্যের নয়, প্রতীচ্যের (পৃঃ ৭৬)

(ঘ) হৃদয় (পৃঃ ৭৬), টলস্টর (পৃঃ ৭৬), আইকেল (পৃঃ ৭৭) লত্রক্লেয়ার (পৃঃ ১১৩), জোহান্সবার্গ (পৃঃ ৮০), বিস্ময়ে (পৃঃ ৯৭), ইত্যাদি বানানগুলি ভুল মুদ্রিত হয়েছে। হবে যথাক্রমে হৃদয়, টলস্টয়, আইফেল, ল' এক্লেয়ার (Lo Eclair), জোহান্সবার্গ, বিষয়ে।

(ঙ) চ্যেৎকভ (পৃঃ ১১) ইংরেজীতে Valadimir certkov— বাংলাতে চার্টকফ্‌ও হতে পারে।

(চ) রোঁমারোঁলা নয় (পৃঃ ৩) সর্বত্রই রম্যাঁরলাঁ। (Romain Rolland) হবে।

(ছ) রেভারেণ্ড কালেনবাক নয়, সেখানে মিঃ কালেনবাক হবে। (পৃঃ ৮০)